আজাদ হিন্দের অঙ্কুর

(শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার)

নিউ এজ পাবলিসার্স লিমিটেড
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিউ এজ পাবলিসার্স লিমিটেড
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট. কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীজানকিনাথ সিংহ রায়।

প্রচ্ছদপট ও নেতাজীর ছবি আঁকিয়াছেন
শিল্পী শ্রীবিমল রায়।

প্রিন্টিং হাউস
১৫৭-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীহীরেন্দ্রকুমার দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

منسوب بہ نام نامی

مولانا ابوالکلام آزاد

رہنمائے اعظم بیدار ہندوستان

জাগ্রত ভারতের সার্থক রাষ্ট্রপতি

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

করকমলেষু—

এই গ্রন্থের কিয়দংশ "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রে এবং একটি ক্ষুদ্রাংশ "সচিত্র শিশির" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকখানি নূতন। পুনা হইতে প্রকাশিত মিঃ ভি, ডি, কালে সম্পাদিত "সহ্যাদ্রি" নামক মাসিকপত্রে শ্রীযুক্ত সদাশিব অনন্ত শুক্ল "ভারতবর্ষ" হইতে ধারাবাহিক ভাবে আমার প্রবন্ধগুলির মারাঠা অনুবাদ করিতেছেন। ইংরাজী ও হিন্দি ভাষাতেও অংশ বিশেষ অনূদিত ও মুদ্রিত হইতে দেখিয়াছি। আমার প্রবন্ধগুলির এইরূপ বহুল প্রচারের জন্য আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। মনে হইতেছে, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সার্থক হইয়াছে। "ভারতবর্ষ" সম্পাদক প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আশ-শ্যাওড়ার বেত্রহস্ত গুরুমশাইয়ের মত লাগিয়া না থাকিলে লিখিতাম কিনা আদৌ সন্দেহ! মল্লিখিত ইহারই ইংরাজী ভাষা The Seed "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় প্রকাশে "পত্রিকা"র শ্রীযুক্ত রবি চৌধুরীর যত্নের ফল।

নিউ এজ্ পাবলিশার্স লিমিটেডের তরুণ কর্ম্মী শ্রীমান অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থখানির সুষ্ঠু প্রকাশে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়াই অত্যল্পকাল মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হইতে পারিয়াছে। আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

বাঙলা-বাস
বালিগঞ্জ, কলিকাতা
বঙ্কিমাধযোগতিথি
১৩৫২

বিজয়রত্ন মজুমদার

সূচী ঃ

	পৃষ্ঠা
ক্ষেত্র	১—১৯
সূচনা	২০—৩৩
কীটপতঙ্গ	৩৪—৪৬
অনাবৃষ্টি	৪৭—৫৬
উদ্যোগ পর্ব্ব	৫৭—৭৫
রথচক্র	৭৬—৯০
স্বপ্নবাণী	৯১—১০১
সমিধ	১০২—১২১
নারীসঙ্ঘ	১২২—১৩২
বালসেনা	১৩৩—১৪৪
জীবন বেদ	১৪৫—১৫৪
হিসাব নিকাশ	১৫৫—১৬১
পরিশিষ্ট	১৬২—১৭১

মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—

আজাদ-হিন্দের অঙ্কুর

প্রথম স্তর—ক্ষেত্র

সেদিন অপরাহ্ণ-ভোজনের পর, শীত-মধুর-রৌদ্র বৈঠকে বাঙ্গলার শিশু সাহিত্যের কথা উঠিয়াছিল। স্থান, পাঞ্জাবপ্রদেশের ডালহাউসী পর্ব্বতে ডক্টর ধরমবীরের বাঙলো; কাল, ১৯৩৭ সালের প্রথম অক্টোবর অথবা শেষ সেপ্টেম্বর (তারিখের একটু গোল আছে), বেলা আড়াইটা; বক্তা এবং শ্রোতা সুভাষচন্দ্র বসু ও এই গ্রন্থের লেখক। বাড়ীতে চারটি মাত্র প্রাণী, সস্ত্রীক ডক্টর ধরমবীর, মাননীয় অতিথি সুভাষচন্দ্র, তস্য অতিথি বিজয়রত্ন মজুমদার। ডক্টর সাহেবের অপরাহ্ণ ভোজনের পর সামান্য একটু 'আড়ামোড়া' ভাঙ্গার সখ্ অথবা অভ্যাস আছে, তিনি তাহারই মর্য্যাদা রক্ষণে গিয়াছেন; গৃহস্বামিনী এই সময়ে ছোটখাট গৃহকার্য্যগুলি সম্পন্ন করেন;—হাটবাজার করিতে লোক পাঠানো, চিঠি লেখা, ডাকে পাঠানো এবং ডাক আনানো ইত্যাদিরও এই সময়। সীবন কার্য্যও এই অবসরে অগ্রসর হয়।

"কিশোরী" নামে এই লেখকের লেখা পুরুষচরিত্রবর্জ্জিত, কেবল-মাত্র কিশোরী লইয়া গঠিত একখানি উপন্যাস ছিল (হয়ত এখনও আছে)। সুভাষচন্দ্র বলিতেছিলেন, তখন বিলাত হইতে ফিরিয়াছি, আই-সি-এসি স্বর্ণশৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে, অথচ কাজে কর্ম্মে মন তখনও

ঠিক পড়ে নাই, জীবনের পথ তখনও পর্য্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে, একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালন করিয়া সাহিত্যিক ও সাংবাদিক যশোলাভের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে একখানা "কিশোরী" হাতে পড়িয়াছিল। আপনার সহিত আলাপ অথবা কুটুম্বিতার সুযোগ তখনও হয় নাই, সুধীরদাদার (ন'দা কি ?—সুধীর বসু) তখনও বিবাহ হয় নাই। বইখানি এত ভাল লাগিয়াছিল, সে আর বলিতে পারি না। তারপর হইতে মাঝে মাঝে খোঁজ রাখিয়াছি ঐ ধরণের কোন বই বাহির হইল কি-না! ইহার কিছুকাল পরে আমার "তরুণের স্বপ্ন" বাহির হয়; আর তাহার কিছুদিন পরে, সাহিত্যিক হইবার যে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তাহাও ভাঙ্গিয়া যায়—সে বোধহয় ১৯২৩-২৪ সালের কথা। দেশবন্ধু বাঙ্গলাদেশকে এক অভিনব ভাব-তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, অনেকের সঙ্গে আমিও ভাসিয়া গিয়াছিলাম। ভাল করিয়াছিলাম কিম্বা মন্দ করিয়াছিলাম জানি না, তবে সাহিত্য, সমাজ, গৃহ, সংসার হইতে দূর হইতে ক্রমে ক্রমে সুদূরে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এখন আপনি বলুন, "কিশোরী"র মত বই আপনি অথবা আর কেহ লিখিয়াছিলেন কি-না এবং সে সব বই পাওয়া যায় কি-না। বাঙ্গলার শিশু ও বালক সাহিত্য আমার বড় ভাল লাগে। ইহাদের যে নিজস্ব ধারাটি আছে, তাহাতে আমাকে মুগ্ধ করে। এখানে এখন 'অপর্য্যাপ্ত' অবসর, কতকগুলা বই পাইলে, গিলিয়া খাইতেও রাজী আছি।

আমার বক্তব্য এই যে, আমি ঐ "কিশোরী" লিখিয়াই হাঁপাইয়া পড়ি, আর লিখি নাই। অন্য কেহ লিখিয়াছেন কি-না সে খবরও রাখি না। উদর-সাহিত্য ব্যতিরেকে অন্য কোন সাহিত্যের সংবাদ রাখিবার অবসরও আর আমার হয় না।

সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, আপনার "বঙ্গবালা" কেমন চলছে বলুন ?

"আমার "বঙ্গবালা" বিস্মৃতির অতল তলে শয়ন করেছেন।

বাঙ্গলার বঙ্গবালারা নবীন তেজে, নবীন গরিমায় প্রতিভাত হচ্ছেন।”

এই সময়ে আমাকে একবার উঠিয়া যাইতে হইল। ড্রয়িং রুমে আমার সিগারেটের টিন ও দেশলাই ছিল, লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম দিগন্ত হইতে দিগন্তবিস্তৃত কালো পাহাড়ের মাথায় মেঘ-মালাদের লাস্য লীলায় সুভাষচন্দ্র মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তপস্যা ভঙ্গের বাসনা ছিল না, একটি সিগারেট ধরাইয়া নিঃশব্দে বসিলাম। সুভাষ-চন্দ্র ধূম পান করিতেন না, ধূমপায়িদের প্রতি প্রসন্নও ছিলেন না; কিন্তু আমাদের আপাদমস্তক ধোঁয়ায় পাকিয়াছে, একটার আগুন হইতে আর একটা সিগারেট ধরাইয়া দেশলাই কাঠির অপব্যয় নিবারণ করিতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ইহাতে তিনি একদিন যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনি দাদা, অদ্ভুত লোক। বাতে এত কষ্ট পান্, অথচ ভাত ছাড়তে অক্ষম; বলেন, লীভার খারাপ কিন্তু লিভারকে ধোঁয়া দিয়ে আরও খারাপ করতে সর্ব্বদাই তৎপর। আর আমাকে দেখুন, ধোঁয়া কোনদিন খাই না এবং ভাতও কতকাল ছেড়ে দিয়েছি তার হিসাবই নেই।

এ কথার উত্তরে আমার বলিবার মত একটিমাত্র কথাই ছিল, তাহাই বলিলাম, এতো ত্যাগ-সামর্থ্য থাকলে আমিও না একজন ছোট-খাট সুভাষচন্দ্র হয়ে পড়তাম!

সুভাষ হাসিলেন।

আমি বলিলাম, সাহিত্যিক হন নাই, মা-সরস্বতী রক্ষা করেছেন! হ'লে অবশ্যই জানতে পারতেন যে, আমাদের মত দুঃস্থ সাহিত্যিকদের ভোজ্য—গালিগালাজ, এবং পেয়—ধূম। কাজেই ওর কোনটা এড়াবার সাধ্য কি!

পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বঙ্গবালা” ছবির কথা আজও আপনার মনে আছে? বলিলেন, খুব আছে। আমিই ত “বঙ্গবালার” উদ্বোধন করি।

নৌকার ভিতরে সেই যে মেয়েটি হঠাৎ কোমর থেকে শানিত ছুরিকা বের করে নিজের ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করলে, সে কি ভুলতে পারি ?

বলিলাম, তবে আরও একটু বলি। ঐ দৃশ্য দেখে বক্তৃতার সময় আপনি যে কলিটি বলেছিলেন, পরের দিনই পূর্ণ থিয়েটারের অধ্যক্ষ ও "বঙ্গবালা"র প্রযোজক মনোময় বাবু সেই কলিটি ঐ স্থানে সংযুক্ত করে দেন। মনে আছে সেই কলিটী—

আপনার মান রাখিতে জননী
কৃপাণ ধরিলে আপনি। *

সুভাষচন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, খুব মনে আছে। আমি ত ফিল্ম-টিল্ম বেশী দেখি না ; অত্যন্ত কম দেখি ব'লে যেটি দেখি, সেটি মনে থাকে। বিশেষ, পল্লীগ্রামের মেয়ে দুর্ব্বৃত্তের আক্রমণে ছুরি দেখিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারলে, এই অসমসাহসিকতার কথা ভুলবার নয়। গল্পটার খুব তারিফ করেছিলুম, বেশ মনে হচ্ছে।

আমি বলিলাম, আমার কথা থাক্। বাঙ্গলার শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল, তাই হোক।

সুভাষ বলিলেন, আমার ঐ সব রঙীন গল্পগুলি বেশ লাগে কিন্তু। বেশ একটা কল্পনা-রঙীন অদেখা অজানা রাজ্যের মাঝে কল্পনার রশ্মি ছেড়ে দিয়ে ছুটে বেড়ান যায়।

* বাঙ্গলা চলচ্চিত্রের প্রারম্ভকালে, মৌলিক গল্প লইয়া চিত্র নির্ম্মাণ বড় বেশী হইত না ; "বিদ্যা-সুন্দর" শ্রেণীর ছবিই উঠিত। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির রচিত 'গল্প' লইয়া দুই একখানি ছবিও হইয়াছিল। লেখকের লেখা গল্প লইয়া চিত্র গঠন সম্ভবতঃ "বঙ্গবালা"ই প্রথম। পূর্ণ থিয়েটারে চিত্রের উদ্বোধন হয় এবং সুভাষচন্দ্র উদ্বোধন করেন। চিত্র-ইতিহাসে ইহা অভিনব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তখনকার দিনের ফরওয়ার্ড ও বাঙ্গলার কথার (লিবার্টি ও বঙ্গবাণী নয় ত ?) অনেকগুলি স্তম্ভ "বঙ্গবালা"র কথায় উৎসর্গীকৃত হইতে দেখা গিয়াছিল। —লেখক।

আমি বলিলাম, আমার কিন্তু আদৌ ভাল লাগে না। আমাদের পূজনীয়া ঠাকুরমা ঠানদি'রা বিহঙ্গম বিহঙ্গমা ও কুচবরণ কন্যার মেঘবরণ কেশের লোভ দেখিয়ে শিশুসমাজের অশেষ অপকার করেছেন বলেই আমার মনে হয়। রবি বাবুর ভাষায়—'রেখেছেন বাঙ্গালী ক'রে, মানুষ করেন নি।' আমি বরাবর ভেবেছি—ঠাকুর্দ্দা ঠাকুরমাদের সজ্ঞানে স্বর্গধামে প্রেরণ করে আমরা যদ্যপি ছেলেমেয়েদের "আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু," অথবা "হঠাৎ বাদশা আবুহোসেনের" গল্পও শোনাতাম, অনেক বেশী উপকার সাধিত হতে পারতো।

সুভাষচন্দ্র চিন্তান্বিতভাবে কহিলেন, তা ঠিক।

আমার উৎসাহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; বলিলাম, দেখুন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের প্রজারঞ্জক রাজা। প্রজারঞ্জন তাঁহার সাহিত্যের অন্যতম মূলমন্ত্র। অশীতিপর জ্ঞানী বৃদ্ধই বা কি, আর ষোড়শী-সপ্তদশী সুন্দরী যুবতীই বা কি, কিম্বা অতিক্ষুদ্র শিশু সন্তানই বা কি, সকলের চিত্তের খোরাক মুক্তহস্তে তিনি সরবরাহ করেছেন। এক কথায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনোরঞ্জন যাকে বলে, তাই করেছেন। শিশু-সাহিত্যেও তাঁর দান অপরিমেয়, অতুলনীয়, অনবদ্য ও অনুপম, একথা অস্বীকার করবে এমন দুঃসাহসী কেউ আছে ব'লে আমি ত জানি না, তাঁর রচনার মধ্যে কুচবরণ কেশবতী কন্যা ও রূপার কাঠি সোণার কাঠির ছড়াছড়ি বার করুন তো, পারবেন না।

"রবীন্দ্রনাথের শিশুকবিতাগুলি সত্যই তুলনারহিত।"

"তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টী জানেন ?"

সুভাষচন্দ্র স্নিগ্ধহাস্যে কহিলেন, বলুন দাদা।

বলিলাম—বলিলাম না, আবৃত্তি করিলাম :

"তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
দীঘির ধারে ঐ যে কিসের আলো ?"

"এমন সময় হারে রে রে রে, রে
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
* * *
"তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে—
আমি আছি ভয় কেন মা করো ?
হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল
কাণে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, "দাঁড়া, খবর্দ্দার,
এক পা কাছে আসিস্ যদি আর—
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার।
টুকরো ক'রে দেবো তোদের সেরে।"
* * *
"ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তরোয়াল ঝম্‌ঝমিয়ে বাজে ;
কি ভয়ানক লড়াই হোল মা যে—
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে
কত লোকের মাথা পড়লো কাটা।"
* * [বীরপুরুষ]

শেষ করিয়া বলিলাম, এই আমাদের দেশের শিশু সাহিত্যের আদর্শ হওয়া উচিত ছিল। পৌরুষের প্রতি, শৌর্য্যের পানে, বীরত্বের দিকে

শিশুমন চালিত যদি না করলো তবে কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হলো ?—বলিয়া সিগারেট ধরাইলাম, ডক্টর সাহেব নিদ্রালস নয়নে শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া ইংরাজিতে বলিলেন, বিজয়রত্ন বেশ থিয়েটার করিতে পারে, মনে হইতেছে। চেহারাটাও ভাল ; গলাটিও মিষ্ট ; ষ্টেজে যায় না কেন ?

আমি হাসিলাম। সুভাষচন্দ্র নীরব। বুঝিতে বিলম্ব হইল না এবং মনে করিতেও আমি গর্ব্ব অনুভব করিলাম যে সুভাষের বলিষ্ঠ ও পৌরুষ মন তন্মুহূর্ত্তে সেই তেপান্তরের মাঠে বালক বীরের উদ্দেশে ছুটিয়াছে। আমি বুঝিলাম, ডক্টর সাহেবও বুঝিলেন ; কিন্তু ধরমবীর মহাশয় সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই রঙ্গময়, হাস্যপ্রিয়। "নাঃ, দিবানিদ্রাটা নষ্ট ক'রে দিলে"—বলিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া আবার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময় আমার সিগারেটের নীল টিনটি সঙ্গোপনে উঠাইয়া লইয়া সরিলেন। চোরের মন বোঁচকার পানে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, ডক্টর সাহেবের কর-কৌশল কোন কাজেই লাগিল না ; ধরা পড়িয়া গেলেন। অতএব, হাসিতে হাসিতে টিনটি রাখিয়া বাকী নিদ্রাটুকু শেষ করিতে গেলেন। আর একটি সিগারেট ধরাইয়া আমি নিঃশব্দে ফুঁকিতেছি, সুভাষচন্দ্র যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন ; রূঢ়কণ্ঠে বলিলেন, আবার একটা ? এরই মধ্যে কতগুলো খেলেন ?

হাসিয়া বলিলাম, দিনে একটিমাত্র টীন খাই, তার বেশী একটিও নয় !

একটীন মানে পঞ্চাশটা ! ভেরী ব্যাড। আপনার বাত বিধান রায়কে গুলে খেলেও সারবে না।

বলিলাম, "আমি বিধানবাবুকে অব্যাহতি দিয়েছি। তিনিও, আমার বাত সারাতে না পেরে মনের দুঃখে বনে—অর্থাৎ বিলাতে পলায়ন

করেছেন।” সত্যই বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় তখন ইউরোপ ভ্রমণ করিতেছিলেন।

দূরের পাহাড়ের মাথায় কুণ্ডলীকৃত মেঘমালা আকাশের গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আমরা বারান্দার যে অংশে আরাম কেদারায় বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, সেই অংশ হইতে রৌদ্রটুকু সরিয়া গিয়াছে ; একটু দূরে পুষ্পিত উদ্যানে তখনও রৌদ্র অক্ষুণ্ণ ছিল, কেদারা দু'খানাকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করা যাইতেছে, লুকোচুরি-ক্রীড়ারত মেঘবালিকা সরিয়া যাইতেই পুনরায় সূর্য্য স্বপ্রকাশ হইলেন। আমরা যেখানে ছিলাম, সেইখানেই রহিয়া গেলাম।

সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, শিবাজী সম্বন্ধে শিশুপাঠ্য কোন ভাল গ্রন্থ বাঙ্গলায় আছে ?

আমি অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিলাম, শিবাজী বলতে গিরিশ ঘোষের ''ছত্রপতি শিবাজী” নাটকখানিই আমার মনের চোখে জ্বল্ জ্বল্ করতে থাকে। নানা নামে, নানা ঢঙে, নানা লোক নানা ভাবে,—কেউ গদ্যে, কেউ পদ্যে, কেউ নাট্যে শিবাজীকে আঁকতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু গিরিশ বাবুর কাছে পৌঁছোবার সাধ্য কারও হয় নি। দুঃখের বিষয়—নাটকখানি পুলিশ অন্ধকূপহত্যা করে ফেলেছে।

“প্রসক্রাইবড ?”

“বহুকাল যাবত।”

“ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঐ একটি চরিত্রই আমার কাছে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্তির মত ভাস্বর হয়ে আছে। শিবাজী চরিত্রের মত আর একটি চরিত্রও ত দেখি না। রাণা প্রতাপসিংহও শিবাজীর তুলনায় তুচ্ছ হয়ে যান। শিবাজী নিয়ে নাটক, শিবাজী নিয়ে গল্প, শিবাজী নিয়ে কাব্য, গাথা, শিশুপাঠ্য বই লিখে দেশময় শিবাজীর আদর্শ তুলে ধরতে হবে ; নতুবা উপায় নেই।”

অকস্মাৎ সুভাষ কেদারার উপরে ঋজু হইয়া উঠিয়া বসিলেন; অস্তাচলগামী রবিকরপ্রভায় অথবা অন্তরের উদ্দীপনা-বিভায়, ঠিক করিয়া বলা দায়, অনিন্দ্যগৌর আননখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সুভাষ কহিলেন, আপনারা কাজের কাজ কিছুই করেন না। গিরিশ-বাবুর "শিবাজী" নাটকখানা প্রসক্রাইবড হয়ে পড়ে রইলো—আপনারা একটা আন্দোলনও করতে পারলেন না! আশ্চর্য্য।

বলিলাম, আশ্চর্য্য হ'বার কথা বটে কিন্তু আন্দোলন যে একেবারে হয় নি, তা নয়।

সুভাষ অবজ্ঞাভরে কহিলেন, আন্দোলনের মত আন্দোলন নিশ্চয় হয় নি।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, নতুন লেজিসলেচারে (আইন-সভাদিতে) আন্দোলন তুমুল ক'রে তুলতে হবে। "শিবাজী"র মত আরও অনেক বই নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে?

গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত তিনখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক—সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম ও ছত্রপতি শিবাজী পুলিশের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত, আমি তাহা বলিলাম। ডি, এল, রায়ের ক'খানি নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের দু'খানি উপন্যাস এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একখানি গ্রন্থের নির্ব্বাসনবার্ত্তাও সুভাষচন্দ্রের গোচর করিয়াছিলাম বলিয়াও মনে হইতেছে।

সুভাষ ইংরাজীতে, দৃঢ়স্বরে বলিলেন, এবার একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।

ঐ তিনখানি নাটকের সম্বন্ধে গুটি কতক কথা বলিবার দরকার আছে। আধুনিক বঙ্গদেশ গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম শুনিয়া থাকিলেও, তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় অবগত নহেন বলিয়াই আমার ধারণা। গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল যে

কয়েকখানি নাটক বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের মধ্যমণি বলিয়া সমাদৃত হইবার দাবী করিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল সেই দাবী অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিত, ঐ তিনখানি নাটক আবার তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৯০৫ সালে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া এই বঙ্গদেশে স্বাদেশিকতার যে গৈরিক স্রাব ভোগবতীর উৎসাকারে উৎসারিত হইয়া বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকেও আলোড়িত করিয়াছিল, বাঙ্গলার সাহিত্য, বাঙ্গলার নাট্যমঞ্চ, বাঙ্গলার কাব্য, বাঙ্গলার গীতি, বাঙ্গলার লোক-গান যে সাগর সঙ্গমাগত নদ নদীর মত সঙ্গম তীর্থকে স্ফীত বিস্ফারিত করিয়াছিল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাহা লিখিত থাকিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। আজ "কুইট্ ইণ্ডিয়া" ধ্বনিতে ভারত ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত, ভারতীয় মানুষ উদ্বুদ্ধ, সঞ্জীবিত। কিন্তু আজিকার শিক্ষিত, স্বদেশভক্ত কয় জন নরনারী জানেন যে বহুকাল পূর্ব্বে, বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ হইতে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার মুখ দিয়া বঙ্গের নরনারীকে সতর্ক করিয়া দিতে, উদাত্তকণ্ঠে কহিয়াছিলেন ঃ

"সিংহাসনে যদি হয় সৌকত স্থাপিত ;
বাঙ্গলার ক্ষতি নাহি তাহে !
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গলায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব।
কিন্তু, সাবধান,
ফিরিঙ্গিরে নাহি দিও সূচ্যগ্র স্থান।"

সেদিনের বাঙ্গলার স্বদেশী মন্ত্রের সাধনের অপর নাম ছিল, শরীর পাতন। বাঙ্গলার সেই মন্ত্রসাধনে বঙ্কিম-সাহিত্য ও বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ কতখানি প্রেরণা দান করিয়াছিল, ইতিহাস তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

গিরিশবাবুর "ছত্রপতি শিবাজী" নাটক ও নাট্যাভিনয় বঙ্গদেশকে মাতাইয়া দিয়াছিল। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের তখন একাদশ বৃহস্পতির দশা। এক রঙ্গমঞ্চে গিরিশবাবুর পুত্র দানীবাবু ছত্রপতির ভূমিকায়, অন্য একটি ষ্টেজে অমরেন্দ্র দত্ত ছত্রপতি শিবাজীর অংশে অভিনয় করিয়া সারা বাঙ্গলাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন। নাটকখানি ভাগ্যদোষে (কাহার ভাগ্য ?) স্বল্পায়ু হইয়া জন্মিয়াছিল—গৌরবরবি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

"এই সমস্ত ইতিহাস যখন জানেন, তখন লিখে রাখা আপনাদের উচিত !"—এই কথাগুলি সুভাষচন্দ্র যেন স্বগতোক্তির মতই বলিলেন।

একটুকাল থামিয়া আবার ইংরাজীতেই বলিলেন, মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগ এখন চলছে ; আরও কিছুদিন চলবে, কিন্তু বিদেশী অক্টোপাস থেকে মুক্তির জন্য শিবাজী মহারাজের আদর্শের শরণ নেওয়া ছাড়া আমাদের গতিমুক্তির তিলমাত্র ভরসা দেখি না।

আমি রহস্যচ্ছলে বলিলাম, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই যাকে অহিংস গান্ধী-পরিচালিত অহিংস-কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করতে হবে, এই হিংস্র বাক্য তার মুখে শোভা পায় ত ?

সুভাষচন্দ্র হাসিলেন ; বলিলেন, দাদা, আপনি কি মনে করেন যে মহাত্মাজী আমার মনের ভাষা জানেন না ? আর এ কথা ত কেবল আমার নয় ; বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক নরনারীর অন্তরের কথা। আপনি রহস্য করছেন, বলুন তো, আপনার মনের মধ্যেও ঐ ভাব কি-না ?

মুখে ছিল অৰ্দ্ধদগ্ধ সিগারেট, সেটাকে তাচ্ছিল্যভরে দূরে ফেলিয়া দিয়া বিশুদ্ধ ভাষায় কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, দোহাই বোস-জা মহাশয় ! অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষীণ লেখনীজীবী ক্ষুদ্র মনুষ্য আমি, হিংসার নামেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায় ! রুদ্রের সহিত আমার একমাত্র সংস্রব সিগারেটের ঐ অগ্নিটুকু ! আমার কথা ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

সুভাষ হাসিলেন। হাসিটা প্রসন্নতার হাসি নয়, তাহা বুঝিলাম, তবে অবজ্ঞার হাসি কিম্বা করুণার হাসি তাহা ধরিতে পারিলাম না। তাই রঙ্গ আর একটু চড়াইবার উদ্দেশ্যে কহিলাম, শিবাজী মহারাজার গল্পের মধ্যে সন্দেশের ঝুড়ির ভিতরে বসে পলায়নটুকুই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।

সুভাষ কহিলেন, শঠে শাঠ্যং—তারও প্রয়োজন আছে। আর এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে একদিন হিংসার পথ ধরতেই হবে। অস্ত্র হাতে, যুদ্ধ ক'রে মেরে এবং ম'রে দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত—স্বাধীন করতেই হবে। আর কি জানি কেন, আমার বিশ্বাস —দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালীই অগ্রণী হয়ে সেই কাজ করবে।

আমি বলিলাম, ১৯০৭-৮এর কথা আমাদের ভাল মনে নেই বটে তবে তখন থেকে বাঙ্গালী সন্ত্রাসবাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে নিরস্ত হয়েছে আবার লেগে পড়েছে এ কথা ত সকলেই জানে। কাজেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হিংসামন্ত্রে বাঙ্গলীর আন্তরিক আকর্ষণ আছে। আমার মনে হচ্ছে, আপনিও সেই নজীরেই ঐ কথা বলছেন। কেমন ?

সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, কি জানি। তা বলতে পারি না।—স্বর অত্যন্ত উদাস, নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

মুহূর্ত্তকাল পরেই তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, জ্বালামুখী কেমন দেখলেন ?

বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে হিংসা অহিংসার দ্বন্দ্ব আলোচনা অধিকদূর অগ্রসর হইতে দিতে নারাজ। আমিও তাহাই চাই। আমার পক্ষে ঐ সকল প্রসঙ্গ—শত হস্তেন……

২

আমার ডালহাউসী-গমনের ইতিহাসটি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হইলেও বলার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীমতী ধরমবীর (উপবিষ্ট)

পশ্চাতে ডক্টর ধরমবীর

সুভাষচন্দ্র　　　　　　　　　　　　লেখক

(ডালহাউসী—অক্টোবর ১৯৩৭)

অমৃতসহর হইতে সুভাষচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া আমি পাঠানকোট্ হইয়া জ্বালামুখী দেখিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া তাঁহার পত্র পাইলাম,—এত কাছে আসিয়াছেন, ডালহাউসী পাহাড়টা দেখিয়া যান্ না।

তথাস্তু করিলাম।

আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া, সুভাষচন্দ্র বলিলেন—দাদা, বড় আনন্দ হলো। তু'চারদিন প্রাণ খুলে বাঙ্গলায় গল্প করে বাঁচা যা'বে।

এই দিনই ডাকে 'খবর' আসে যে, গান্ধীজী সুভাষবাবুকে (গান্ধীজী প্রত্যক্ষে পরোক্ষে বরাবরই সুভাষবাবু বলিতেন) আগামী বর্ষের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সুভাষবাবু ঐ 'খবর'-সম্বলিত পত্রখানি শ্রীমতী ধরমবীরকে দিলেন এবং সদ্যাগত আমাকে তাঁহার সহিত এই বলিয়া পরিচিত করাইলেন, মস্ত গল্প-লেখক, আমার প্রিয় বন্ধু—। একজনকে অপর একজনের নিকট পরিচিত করাইবার সময়, বোধ করি একটু অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইতেই হয়! তায় দোষ কি!

ঐ দিন আর একস্থান হইতে আরও একটি 'খবর' আসিয়াছিল। 'খবর'টি পাঠ করিয়া সুভাষচন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিজয় বোস্ (অনারেবল বি, কে, বাসু—লেখকের মিতা) কবে মারা গেলেন?

'মিতে' বিজয় একরাত্রে এক স্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, আমরাও গিয়াছিলাম; আমরা বেতো রোগী, ভোজন করিলাম না; তিনি বহুমূত্রের রোগী হইয়াও ভোজনে পরাম্মুখ ছিলেন না, ভোজন করিলেন। সকালে টেলিফোনে শেষ খবর আসিল, মিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মাসখানেকের কথা।

সুভাষচন্দ্র বলিলেন, করপোরেশনে তাঁর জায়গায় অল্ডারম্যান হবার জন্যে অনুরোধ এসেছে। এই দেখুন।

আমি বলিলাম, এটা কেমন যেন খাপছাড়া দেখায় না ? কোথায় নিখিল ভারতের কংগ্রেসের অধিনায়ক, আর কোথায় কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ! আমার মতে, আপনার না যাওয়াই ভাল।

তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে মতের মিল হ'বার সম্ভাবনা নেই সে ত আপনি ভালই জানেন। আগে দু'একবার আপনি, বাঘাবাবু (বাগবাজারের শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ও মেজদা (শ্রীশরৎচন্দ্র বসু) আলোচনা চালিয়েছিলেন, মনে নেই ? ভাল কথা, আপনার বন্ধু জে, সি, মুখার্জ্জি কোথায় ?

আপাততঃ বিলাতে—সপরিবারে, ভ্রমণোদ্দেশ্যে।

মিঃ মুখার্জ্জির কার্য্যকাল শেষ হয়ে এলো বোধ হয়, কলকাতা কর্পোরেশনে, নূতন চীফ নিয়োগ করতে হ'বে।

আমি বলিলাম, সেবারে আমি ও বাঘাবাবু যখন আলোচনা চালিয়েছিলাম তখনও যে কথা বলেছিলাম, এখনও সেই কথাই বলছি, জে, সি, স্বেচ্ছায় কর্পোরেশন ত্যাগ না করলে আপনাদের সাধ্য হ'বে না, তাঁকে বিদায় ক'রবার। তাঁর সততা ও সদাশয়তা অভেদ্য বর্ম্মের মত তাঁকে ঘিরে রেখেছে, আপনাদের অস্ত্র যত ক্ষুরধার শাণিত হৌক না কেন, বিফল হ'বে।

আচ্ছা, দেখা যা'বে। যদি হারি, আপনি আমাকে দুয়ো দেবেন।

তা দিই আর নাই দিই, পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তা বলে দিলাম।

আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল। শুধু সেইবার নয়, তাহার পরের বারও কর্পোরেশনে মিঃ মুখার্জ্জির নিয়োগ রোধ করা সম্ভব হয় নাই। স্বয়ং রাষ্ট্রপতির সমস্ত চেষ্টা বারম্বার ব্যর্থ হইয়াছিল।

ইহার বহুদিন পরে, চাকরীর মেয়াদ প্রায় দেড় বৎসর হাতে থাকিতে, তিনি স্বেচ্ছায় কর্পোরেশন ত্যাগ করিয়া টাটার নগরাধিপ হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কথাটা আজ অবান্তর হইলেও

আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত, আমি কায়মনে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে বসুভ্রাতৃদ্বয় কর্পোরেশনে জে, সি'র বিরুদ্ধে দুইযুগ-ব্যাপী আপ্রাণ সংগ্রামে শক্তিক্ষয় না করিলে কর্পোরেশনের, কলিকাতা মহানগরীর, বঙ্গদেশের তথা জাতীয় কর্ম্মের অনেক উন্নতি ও অনেক কল্যাণ হইতে পারিত।

৩

শ্রীমতী ধরমবীর আসিয়া বলিলেন, তোমাদের গল্প কি আর শেষ হইবে না? চা খাইবে কখন?

সুভাষচন্দ্র বলিলেন, আপনি দেন নাই বলিয়াই আমরা খাই নাই।

আমি বলিলাম, "আমরা সুবোধ বালক, খাদ্য দ্রব্য পাইলেই খাইয়া থাকি।"—শ্রীমতী মার্কিণনন্দিনীর কিন্তু আচারে ব্যবহারে বঙ্গগৃহিণীর সহিত এতটুকু পার্থক্য নাই। তাড়াতাড়ি চা সাজাইতে চলিলেন।

এই সময়ে, রঙ্গস্থলে ডক্টর প্রকাশমান হইয়া বলিলেন, অভাবে সিগারেট সিগারেটই সই। ভাল, বিজয়রত্ন, তোমার কি কাল যাওয়াই ঠিক?

আমি সুভাষচন্দ্রের পানে চাহিলাম। তাহার কারণ ছিল। সকালে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, আমার জন্য কোন ডাউন মোটরকারে একটি শীট্ রিজার্ভ করিয়া দিবার জন্য। ৬৭ (বোধ হয় ৬৭, ঠিক মনে হইতেছে না) মাইল বাসে চড়িয়া নামিতে হইলে আশঙ্কা ছিল, ক্ষীণ-প্রাণটি পাঠানকোটের পথেই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। মোটরকারে ভাড়া আট গুণ অধিক, তা আর কি করা যাইবে? আবার মোটরকার সংখ্যায় স্বল্প, স্থান

প্রায়ই দুর্লভ, এ কথা পাহাড়ে উঠিবার সময়ে আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম, তাই সুভাষচন্দ্রকে বিনীত অনুরোধ। তিনি বলিয়াছিলেন, ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; কিন্তু কিছুই করেন নাই, আমার চাহনীটা তাহারই তিরস্কারসূচক। সুভাষচন্দ্র বলিলেন, মোটরের জন্য চিন্তা নাই দাদা। খান্নারা আমাকে খুব খাতির করে; রাত দুপুরে চাইলেও মোটর পাবেন।

আমি ডাক্তারকে কহিলাম, হ্যাঁ, ডক্টর, কাল নামবো।

ডক্টর বলিলেন, তবে চলো বাগানে, একসঙ্গে বসে একটা 'তসবীর' ঘেঁচা যাক্। ফটোগ্রাফার এসেছে; হাজির হ্যায়।

শ্রীমতী জিজ্ঞাসিলেন, আগে ফটো, না আগে চা?

ফটোগ্রাফার নিকটেই কোন অদৃশ্য স্থানে ছিল, দৃশ্য হইয়া হিন্দীতে সেই বলিল, মেঘ করিতেছে, আলো কমিয়া গেলে ছবি হইবে না।

শ্রীমতী ধরমবীরকে মধ্যে বসাইয়া, একখানি গ্রুপ ও প্রত্যেকের একখানি করিয়া স্বতন্ত্র ছবি তোলা হইল।

চা পানান্তে বেড়াইতে যাইবার সময়ে সুভাষচন্দ্র বলিলেন, শিবাজী-সাহিত্যের কথাটা ভুলবেন না।

বারান্দার এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমরা ডাক্তার সাহেবের প্রতীক্ষা করিতেছি, সুভাষচন্দ্র পুনরায় কহিলেন, বালক সাহিত্য, বালিকা সাহিত্য, তরুণ তরুণী সাহিত্য শিবাজীর কাহিনীতে ভরিয়ে দিন। ভারতবর্ষের যদি কোন দিন উদ্ধার সাধিত হয়, শিবাজীর মত কোন নেতার দ্বারাই হবে। আমার এ কথাটি মনে রাখবেন।

ডক্টর ধরমবীর গায়ে অলষ্টার, গলায় গলবন্ধ, তদুপরি আবার মাফলার এবং মাথায় টুপি—নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিলেন, শীত তাঁহার কি করিবে! আমাকে বলিলেন, বাপু হে, সুভাষ না হয়

গান্ধীব্রহ্মচারী, খদ্দরেই শীত তাড়ায় ; তুমি ত বাপু তা নও, তুমি গরীবের ছেলে—থুড়ি, গরীবের স্বামী, গরীবের বাপ, গরম কাপড় চোপড় বাহির কর, কেন নিউমোনিয়া করিয়া বেচারা স্ত্রীকে বিধবা করিবে ?

বলিলাম, ডাক্তার সাহেব, অধীনের জননী অদ্যাপি জীবিত, স্ত্রীর পতিশোকের চেয়ে মাতার পুত্রশোক কিছু মাত্র কম শোচনীয় নয়।

—তবে ত আরও ভাল। যাও, শাল টাল চড়াও।

সুভাষবাবুর ঘরে আমারও কাপড় চোপড় থাকিত। শাল বাহির করিতে গিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও ঢুকিয়াছেন, তাঁহার গান্ধীটুপি লইতে হইবে। আমার পার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের শিবাজী নাটক আপনার আছে ? আমাকে পড়তে দিতে পারেন ?

বলিলাম, দুঃখের কথা কেন বলেন ! একদা নিষিদ্ধ পুস্তকমাত্রই রাখতাম। বিমল কর নামে এক "বই গাঁট কাটা"—তাকে আপনারা সবাই চেনেন, পড়তে নিয়ে গিয়ে গায়েব করে দিয়েছে ; সাধু ভাষায় বলে 'কৈ না ত' ! তবু, চেষ্টা করব, যদি পাই, পাঠিয়ে দোব।

—দোহাই আপনার, পাঠিয়ে বুদ্ধির বিকাশ করবেন না। কলকাতায় আমাকে দেবেন।—আমরা ভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

তখন কে জানিত যে একদিন, আমাদের জীবদ্দশাতেই এই নির্বীর্য্য জাতির মধ্যেই বীর্য্যবান শিবাজীর উদ্ভব হইবে! তখন কেহ কি কল্পনাও করিতে পারিত যে একদিন এক হৃতশৌর্য্য বাঙ্গালী-শিবাজী বিরাট আই·এন্·এ'র সৃষ্টি করিয়া মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিতে উদ্যত হইবে এবং আমরা

তাহার সেই বিরাট ও গগনচুম্বী কীর্ত্তি স্বচক্ষুতে দেখিব ও স্বকর্ণে শুনিব? তখন কি সুদূর কল্পনাতে ইহা স্বপ্নেও দেখিয়াছিলাম যে দিল্লীর ঔরঙ্গজেবের অপেক্ষা শতগুণ শক্তিমান সাম্রাজ্যবাহিনীর সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া—সন্দেশের ঝুড়ির ভিতরে লুকাইয়া নহে—এমনই সহজ স্বচ্ছন্দভাবে বাঙ্গালী শিবাজী কলিকাতা—বঙ্গদেশ—ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া কোথায় রাশিয়া, কোথায় বালিন, কোথায় রোম, কোথায় টোকিও, কোথায় সোনান্ করিয়া বেড়াইতে পারিবেন!

যখনই মনে হয়, 'স্বপ্ন সম—হতেছে বিশ্বাস।'

আজ কত কথাই মনে হইতেছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে নোটিশ, আল্‌টিমেটাম—তল্পীতল্পা গুটাইবার নির্দ্দেশ দেওয়াটা সুভাষচন্দ্রের বাতিকের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসাধিবেশন হইতে সুরু করিয়া বারবার আল্‌টিমেটাম—চূড়ান্ত আদেশ দিবার জন্য তাঁহাকে অতিমাত্র অধীর ও উদগ্রীব দেখা যাইত। প্রকাশ্যে না হোক্, সভাসমিতিতেও না হোক, বৈঠকে ও বৈঠকখানায় এই আল্‌টিমেটাম প্রসঙ্গে রঙ্গ রহস্যেরই সৃষ্টি হইত; অনেকের নিকট ইহা নিছক ছেলেখেলা বলিয়াই বিবেচিত হইত। কংগ্রেসের রাইটিষ্টদের উপরে এক চাল চালিবার—এক হাত লইবার জন্যই লেফটিষ্টদের এই আল্‌টিমেটাম-ধাপ্পা, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই এক মত ছিলেন। অতি বড় স্বপ্নবিলাসীও কি স্বপ্ন দেখিতে ভরসা পাইয়াছিলেন যে সেই আল্‌টিমেটাম সুভাষের অন্তরের ভাষা, বুকের রক্ত-লিখায় লিখিত হইতেছিল! তাহার মধ্যে রাইট লেফটের দ্বন্দ্ব ছিল না; রাজনৈতিক ধাপ্পার সংস্রব ছিল না; হাততালির প্রলোভন ছিল না। ছিল শুধু বন্ধনদশার যন্ত্রণা, পরাধীনতার পুঞ্জীভূত বেদনা। ছিল কেবল পরবশ্যতার পর্ব্বতপ্রমাণ গুরুভার অবনমনের আকুল আকাঙ্ক্ষা। স্বাধীনতা·

আস্বাদের ব্যাকুল বাসনা। বিংশ শতাব্দীর নির্বীর্য্য নিরস্ত্র দুর্ব্বল বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে এই আগ্নেয়গিরি কতকাল লুক্কায়িত ছিল, কে জানে, একদিন অগ্ন্যুৎপত্তি হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ—সমগ্র জগৎ প্রদীপ্ত করিয়া দিল।

মহাভারতবর্ষব্যাপ্ত আজাদ-হিন্দ ফৌজের কলকোলাহল মধ্যে বসিয়া আমি সেই বিগত দিনগুলির কথা ভাবিতেছি; আর নিজের মনে সঙ্গোপনে বলিতেছি, আজাদ-হিন্দ বাহিনীর অঙ্কুর ত আমি দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সেই অঙ্কুর যে অত্যল্পকাল মধ্যে অভ্রভেদী ও অবিস্মরণীয় মহামহীরুহ রূপ ধারণ করিবে, কল্পনা-বিলাসেও কি তাহা ভাবিতে পারিয়াছিলাম? বোধ করি তাই দেখিয়াও দেখিতে পাই নাই! বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই! হায় রে, অন্ধের পক্ষে আলোক ও অন্ধকার, মেঘ ও গিরির মত, সবই যে সমান।

বন্দে মাতরম।

জয় হিন্দ।

দ্বিতীয় স্তর—সূচনা

সাজ সজ্জা করিয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল। ঠাণ্ডার দেশ, সমাগত সন্ধ্যা, সাজ-সজ্জার দরকার।

ফটক সন্নিকটে আসিতে দেখি, একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া একটি পাঞ্জাবী তরুণী ক্যামেরা 'চার্জ্জ' করিতেছে। আমরা তাহার পানে চাহিতে সে বোধ করি একটু 'লজ্জা' পাইয়া গাছের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল; আমরা তিনজনেই হাসিলাম।

সুভাষচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, এ রকমটা নিত্যই হয়।

আমি মেয়েটির দিকে অগ্রসর হইলাম। বলিলাম, হিন্দীতে, (আমার হিন্দীতে) আমরা তিনজন আছি, হ্যাঁ গা, তুমি কাহার ছবি তুলিতে চাও?

মেয়েটি হাসিল (আমার হিন্দী শুনিয়া হাসিল কি? তাহাই সম্ভব; কারণ সে হিন্দী শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারে এমন লোক ত দেখি না); হাসিয়া নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে কহিল, বসুজীর তসবীর।

আমি কাতর কণ্ঠে কহিলাম, কেন আমাদের ছবি লইবে না?

মেয়েটিকে লাজুক ভাবিয়াছিলাম, সে কিন্তু আদৌ লাজুক নহে। বেশ দৃঢ়স্বরে কহিল, নেহি জী।

আমি 'হতাশভাবে' ফিরিতেছি, তরুণী সুভাষবাবুর উদ্দেশে স্পষ্ট ও শুদ্ধ ইংরাজীতে কহিল, আপনি একবার এদিকে চাহিবেন কি?

সুভাষচন্দ্রের বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না।

তরুণীর ক্যামেরা 'ক্লিক্' করিয়া উঠিল; তরুণী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্মিতহাস্যে কহিল, থ্যাঙ্কস।

তাহার বয়স কতই বা হইবে? তেরো-চোদ্দ, বড় জোর পনেরো-ষোল হইলেও হইতে পারে, তাহার বেশী কিছুতেই নয়। ঐ বয়সের বাঙ্গালীর মেয়ে আমার আবেদন ঐরূপ দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে এবং তাহার নিজস্ব অভিলাষ এমন অকুণ্ঠ কণ্ঠে প্রকাশ করিতে পারিত কি? অন্য দেশের খবর জানি না, বলিতেও পারি না, তবে আমার বাঙ্গলা দেশের কথা ভালই জানি। বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে ঐ বয়সটা অত্যন্ত মারাত্মক—বিকাশের বাসনা ও প্রকাশের কামনা অপরিসীম, অথচ আত্মগোপনের প্রবল প্রচেষ্টা আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি সর্ব্বাঙ্গ চাপিয়া ধরিতে চাহে; দৈহিক অবস্থাও তদনুরূপ। কুসুমিত উপবনের মত তরুণ অঙ্গ পত্রে পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়া বিকাশ-ব্যাকুল, অথচ লোকচক্ষু কি তীব্র, কি অন্তর্ভেদী বলিয়াই না বোধ হয়! লোক সমাজের অভ্যন্তরে থাকিয়া, লোকচক্ষুকে এড়াইতে পারিলেই যেন বাঁচে। এই তরুণীটি বঙ্গদেশের মাটীতে জন্মে নাই, বাঙ্গলার জল বায়ু তাহাকে স্পর্শ করে নাই, বঙ্গবালার সহজাত লজ্জা সঙ্কোচের সহিত তাহার পরিচয় হয় নাই। তাই যখন আমরা কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াছি, দ্রুতপদে হাঁটিয়া আবার আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া, সহাসনয়নে আমার পানে চাহিয়া, ইংরাজীতে অকুণ্ঠকণ্ঠে সে কহিতে পারিল, আপনারা দু'জন একমিনিট দাঁড়াইয়া পড়ুন, আপনাদেরও একখানি ছবি লইতে পারি।

আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, না, আমাদের জন্য তোমার ফিল্ম অপব্যয় করা সঙ্গত হইবে না।

তরুণী হাসিমুখে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া আর একবার তাহার আরাধ্য বীরকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া, সৌখীন ডাল্‌হাউসীর

পার্ব্বতীয় বনে সরু একটা পথ ধরিয়া বনানী মধ্যে সৌখীন বনদেবীর মত লীলায়িত ভঙ্গীতে অন্তর্দ্ধান করিল।

ডালহাউসী পাহাড়টা ঠিক দার্জ্জিলিং, শিলং, সিমলা, নৈনীতাল, মুসৌরীরই মত। উচ্চতায় কোথাও সাত, কোথাও আট হাজার ফুট; প্রকৃতিটাও পুরাপুরি পার্ব্বতীয়। আকাশে মেঘ নাই, কিছু নাই, হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি আসিতে পারে। আবার তখনই বৃষ্টিবাদল বিতাড়িত করিয়া প্রখর রৌদ্র কিরণে পাহাড় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে। আমরা পথের মধ্যে এক পসলা জোর বৃষ্টি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম। শীতের দেশ, আসন্ন সন্ধ্যা, তায় মুষলধারা! তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া, জামা জুতা কাপড় বদলাইয়া বারান্দার আরাম কেদারায়, পায়ের উপরে কম্বল চাপাইয়া কেহ চা, কেহ কফি পানান্তে গরম হইয়া বসা গেল। আমার সিগারেটের খরচটা এখন কিছু বেশী হওয়ার কথা, রসিকজনমাত্রই তাহা স্বীকার করিবেন; কিন্তু 'অরসিক' ধরমবীর মহাশয় স্বীকার ত করিলেনই না, অধিকন্তু গালিগালাজ করিয়া স্থানান্তর গমন করিলেন; বলিয়া গেলেন, তাম্রকূট-ধূম্র সহ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে।

আসলে তাহা নহে; কোনও দর্শনপ্রার্থীর আগমন ঘটিয়াছিল।

১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের কথা পথে সুরু হইয়াছিল, বৃষ্টির আক্রমণে কথা শেষ হয় নাই। তাহারই সূত্র ধরিয়া আলোচনা আরম্ভ হইল।

সকলের স্মরণ থাকিতে পারে, আটাশ সালের কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র ছিলেন—স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়ক; ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রধান সম্পাদক; যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত অভ্যর্থনা সমিতির অধ্যক্ষ; কংগ্রেস অধিবেশনে পতিত্ব করিয়াছিলেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। গান্ধীজী অধি-

বেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। তরুণ ও প্রিয়দর্শন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে বিরাট শক্তিধর বলিয়া বুঝিবার ও জানিবার সুযোগ সেইদিনই প্রথম ঘটিয়াছিল। পৃথিবী প্রায়শঃ ভ্রান্তদৃষ্টি ; কিন্তু এক্ষেত্রে অভ্রান্তদৃষ্টিতে সেইদিন যাহা দেখিয়াছিল, আজ সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে তাহাই অবলোকন করিতেছে। আজিকার বিশ্বে জওহরলালজীর স্থান চিন্তানায়কগণের সর্ব্বাগ্রে, সকলের পুরোভাগে বলিলে একটুও বেশী বলা হইবে না।

আমার স্মরণশক্তি কোনকালেই ভাল ছিল না, এখন আরও খারাপ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তবু যতদূর মনে আছে, এখানে নবীন সুভাষকে লইয়া প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। রাজনৈতিক তথা স্বাধীনতার সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের অতি মাত্রায় অস্থিরতা ও অধীরতা, দ্রুত অগ্রগমনের জন্য প্রবল চাঞ্চল্য, আমার মনে হইতেছে, এই অধিবেশনের কালে সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। নবীনে ও প্রবীণে মতবিরোধের সূচনা কোথায়, কেমন করিয়া, অথবা কি কারণে তাহা এমন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, রাজনীতির সহিত আত্মীয়-কুটুম্বিতাসম্পর্কলেশশূন্য আমার পক্ষে, সে কাহিনী এতকাল পর্য্যন্ত মনে রাখা কঠিন ; মনে রাখিতেও পারি নাই ; না রাখিয়া অপরাধ করিয়াছি বলিয়াও মনে করিতে পারিতেছি না। আমি স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের টেক্সট বুক লিখিতে বসি নাই যে, ব্লাকহোল্ ট্র্যাজিডি অসত্য লিখিলে অনুমোদনে বঞ্চিত হইতে হইবে। কিন্তু এইটুকু বেশ ভাল করিয়াই মনে আছে যে নবীনে প্রবীণে সঙ্ঘর্ষটা এক সময়ে দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং মিটমাটের আশা প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। আর মনে আছে, মিটমাটের উদ্দেশ্যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ছুটাছুটি। একবার প্রবীণের শিবিরে, একবার নবীনের ক্যাম্পে অহরহ তাঁহার সেই 'প্রায়' সাত ফুট দীর্ঘ দেহ লইয়া গমনাগমন

লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে কি? বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের বৃন্দাদূতীর ভূমিকা অভিনয়ের বিশেষ কারণ ছিল।

পণ্ডিত মতিলাল ছিলেন, অত্যন্ত রাশভারী, একগুঁয়ে লোক। একবার যে কথায় 'না' বলিতেন, অনন্তকালেও তাহা 'হাঁ' হইত না; একবার যে লোককে ভাল চোখে না দেখিতেন, সে লোক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইয়া অথবা লঙ্কেশ্বর দশানন সাজিয়া সামনে চলা-ফেরা করিলেও চক্ষু ফিরাইতেন না। সকলেই জানিত, তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন কদাচিৎ সম্ভব হইত। সেদিনের এবং আজিকার দিনেরও কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ মধ্যে মতিলালজীর মত ঋজু, স্পষ্ট, সরল, অমায়িক অথচ অত্যন্ত দৃঢ়, কুলিশকঠোর এবং অনমনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সত্যই বিরল! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। নবীন ও প্রবীণে বিরোধ যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক না কেন, পণ্ডিত মতিলাল নবীনের কথা কাণে তুলিবেন না, তাহাদের 'মুখদর্শন' করিবেন না, এই অব্যক্ত সঙ্কল্প প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল; অথচ অবস্থা এমন যে সন্ধি না হইলেই নয় কিন্তু কঠিন-কঠোর-অপরিবর্ত্তনীয় 'না' শুনিবার জন্য কে যাইবে? কাহার এমন অকুতো সাহস?

বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় অসমসাহসিক ব্যক্তি, সর্ব্বজনে সুবিদিত, অধিকন্তু তিনি স্বয়ং নবীনদলভুক্ত। যদিচ বর্ত্তমান বিরোধে তাঁহার অভিমত প্রবীণেরই অনুকূল, তথাপি স্বগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি পূর্ণ-মাত্রাতেই ছিল। মিলনাকাঙ্খী হইয়া তিনি নিজেই দৌত্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

ডাক্তার বিধানের উপর মতিলালজীর স্নেহ গভীর, বিশ্বাস অসীম, শ্রদ্ধা অনন্ত। মতিলালজী প্রায়ই বলিতেন, আমার দেহখানার তত্ত্বাবধানের ভার 'ডাক্তার বিধানের' উপর ছাড়িয়া দিয়া আমি পরম নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিয়া যাই। শুনিয়াছি, পরবর্ত্তীকালে,

বিধানচন্দ্রের প্রসারিত বাহুর উপরে দেহ-ভার ন্যস্ত করিয়া পণ্ডিতজী প্রশান্তচিত্তে শান্তির রাজ্যে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন।

মতিলালজীর দরবারে বিধানচন্দ্রের ওকালতি বিফলে গেল না; সুকঠোর 'না' অতি সহজেই সু-কোমল 'হাঁ' হইয়া গেল। এ সম্বন্ধে অধিক তথ্য বলিবার প্রয়োজনাভাব। কংগ্রেসের ইতিহাসে সে কাহিনী অবশ্যই লিপিবদ্ধ আছে। মোট কথা এই যে, ডাক্তার বিধানচন্দ্রের চেষ্টায় তখনকার মত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও, কংগ্রেসী মহলে সুভাষচন্দ্রের (এবং আরও কয়েকজনের) উপর একটা প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস ও সন্দেহের মেঘোদয় হইয়াছিল। অনেক দিনের কথা সে, ভুলভ্রান্তি অসম্ভব না হইতেও পারে, তবে মনে হইতেছে, জন্মভূমির স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সুভাষচন্দ্রের অন্তরের বেগ এবং আবেগ, গতি এবং প্রকৃতি অতি মাত্রায় অর্থাৎ অত্যন্ত দ্রুত, অতএব সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং নীতির বিচারে কংগ্রেসের অনেকেরই কাছে তাঁহার অধারতা অসঙ্গত ও অশোভন বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল। শৃঙ্খলিত মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির অত্যুগ্র কামনাই যে উত্তরকালে একদা এই সুভাষচন্দ্রকেই স্বদেশ, স্বজন-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরদেশে লইয়া গিয়া সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করাইয়া স্বয়ং তাঁহাকে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিবে—করিতে পারিবে, অথবা করিতে পারা সম্ভব হইবে, সেদিন, সেকালে ইহা যে অতি বড় দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল! শত শত বৎসরের পরপদানত, আপাদ-মস্তক-শৃঙ্খলিত, নিরস্ত্র, নিঃসহায় ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসামন্ত্রদীক্ষিত ভারতবাসী যে কোনও কালে, কোনও অবস্থায় এই অসম্ভব সম্ভব করিতেও পারে ইহা সেদিন সুদূর কল্পনারাজ্যেরও বহির্ভূত ছিল! সেদিন সুভাষের অন্তরে প্রজ্বলিত অগ্নি প্রবীণের চক্ষুতে আলেয়া রূপেই প্রতিভাত হইয়াছিল। অনেকে আবার বিরুদ্ধ মনোভাব গোপন রাখিতেও অক্ষম হইয়াছিলেন। গান্ধীজীর উক্তিতেও বিদ্রূপের করুণ

সুর ধ্বনিত হইয়াছিল, আজও, এতকাল পরে, তাহা বেদনার সহিত স্মরণ করিতে হইতেছে। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর ও বাহিনীর অধিনায়কের যোদ্ধৃবেশ ও যোদ্ধাসম্ভব কুচকাওয়াজ দর্শনে সার্কাসের অভিনয়ের সহিত ব্যঙ্গাত্মক তুলনা গান্ধীজীই করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যেও এমন লোকের অভাব ছিলনা, বহুদিন পর্য্যন্ত যাঁহারা রঙ্গভরে অথবা ব্যঙ্গভরে সুভাষবাবুকে জেনেরাল অফিসার কম্যাণ্ডিঙের অপভ্রংশ "গক্" (G.O.C.) আখ্যায় আখ্যাত করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র বক্র কটাক্ষ না করিয়াও বলিতে পারি (অন্যের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আদৌ ধর্ত্তব্য নহে!), সুভাষের সেদিনের সেই সমরনায়কের বেশ বঙ্গীয় তরুণের চিত্তপটে যে চিত্রখানি বিচিত্র বর্ণে, আপন গর্ব্ব গৌরবে, আপনার মহিমায় মুদ্রিত— অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, আজও, দুই যুগান্তেও তাহার ঔজ্জ্বল্য ও মাহাত্ম্য অমলিন ও অপরিম্লান। মলিন হওয়া দূরের কথা, আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিকে জাতির জীবন-প্রভাতরূপে বন্দিত করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। একদিন যাহা খড়কুটায় সজ্জিত কাঠামো মাত্র ছিল, কালে তাহাই দশপ্রহরণধারিণী দনুজদলনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পূজামণ্ডপ আলোকিত করিয়াছে।

সুভাষচন্দ্র কহিলেন, আপনারা ত খবর রাখেন না, হার্দেকার প্রথম যখন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়তে লেগেছিল, কেউ তার কথা তখন কাণেও তোলে নি। হার্দেকার নাছাড়বান্দা, অক্লান্ত পরিশ্রমে বাহিনী গড়ে তুললো। গোড়ার দিকে যাঁরা অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি, তাঁরাও 'হাঁ' হয়ে গেলেন। কংগ্রেস বাহবা দিলে; স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ক্রমে কংগ্রেসের অঙ্গ হয়ে গেছে। আমি বরাবরই তার দিকে ছিলাম; জওহরলালেরও কতকটা সহানুভূতি হার্দেকারের দিকে ছিল। কলকাতা কংগ্রেসে আমি

হার্দেকারের চেয়ে আর একটু অধিক দূর অগ্রসর হতে চেয়েছিলাম। আমার বরাবরের মত এই যে, জাতীয় সৈনিকবাহিনী গড়তে হ'লে, তাদের সামরিক পোষাকও পরাতে হবে, সামরিক শিক্ষাও দিতে হবে; তা না দিলে হবে না।—এক মুহূর্ত্ত থামিয়া পুনরায় বলিলেন, আমরা ভাগ্যদোষে (সুভাষচন্দ্র ভাগ্য বিশ্বাস করিতেন, দেখা যাইতেছে) নিরস্ত্র, আমাদের অস্ত্র নাই, সে অবশ্য দুঃখের কথা; কিন্তু অস্ত্র ছাড়া যেটুকুর প্রয়োজন, তা কেন না করবো!

আমি হাসিয়া বলিলাম, হাতী ঘোড়ার পাত্তা নাই, আগেই চাবুকের সন্ধান?

সুভাষচন্দ্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ম্লান দীপালোকেও সুগৌর-সুন্দর বদনমণ্ডল রক্তিমাভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কহিলেন, ভুল, দাদা, বিষম ভুল। হাতী ঘোড়া আমাদের আছে, নাই চাবুক।—একটু থামিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিলেন, চাবুক বলছি আমি ট্রেনিংকে। ট্রেনিং না পেলে, 'ডিসিপ্লিন' না শেখালে আমাদের জাতীয় বাহিনী কি কেবল পোষাকের শোভা দেখিয়েই লোককে চরিতার্থ করবে? একদিন তারাই হবে দেশের সৈন্য, দেশের যোদ্ধা। তাদের যদি সেই ভাবে গড়ে তুলতে না পারি, আমরাই ঠকবো। সুভাষ থামিলেন।

অনেকক্ষণ নীরবতায় কাটিল। আজ মনে হইতেছে, দেশের সৈন্য, জাতির যোদ্ধা সংগঠনের পরিকল্পনায় তাঁহার দূরদৃষ্টি সেই সময় অনেক দূরে—সম্মুখে প্রসারিত, দিগন্ত হইতে দিগন্ত বিস্তৃত, মেঘময় হিমালয় পর্ব্বতমালার ওপারে, বঙ্গোপসাগরের পরপারে, হয়ত বা ভারত সীমান্তেরও পারে চলিয়া গিয়াছিল। আমার সিগারেটের প্রবল ধুম্রবাষ্পেও তাঁহার চিন্তা ক্ষুণ্ণ হইল না।

কিয়ৎপরে কহিলেন, দাদা, সামরিক বেশভূষা ও আদব কায়দার ওপর আমাদের মত দুর্ব্বল, নিরস্ত্র ও পরাধীন দেশের লোকদেরও যে কতখানি সম্ভ্রম ও সমীহ তা বোধ হয় আপনারা কল্পনা করতেও

পারেন না, (এ কথাটা কিন্তু ঠিক নয়! পারি না আবার? খুব পারি! নহিলে রাস্তা দিয়া বীরপদভরে মিলিটারী মেদিনী দলিত করিয়া যায় যখন, হুড় হুড় দূঢ় দূঢ় করিয়া, আমরা গোষ্ঠিসুদ্ধ ছাদে উঠি কেন?) অন্যে পারে কা কথা। মহাত্মা গান্ধী যখন সামনে দিয়ে যান, তখন লোকের মনে শুধু ভক্তিই জেগে ওঠে, পায়ের ধূলো নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়—এই মাত্র! কিন্তু আমাদের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী যখন নিয়মবদ্ধ সারিবদ্ধ হয়ে কদমে কদমে চলে যায় তখন জনতা দু'ধারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে কি ভাবে, জানেন? ভাবে, আমিও কেন স্বেচ্ছাসেবক হই নি? হোলে আমিও ত অমনি বীরদর্পে কদমে কদমে হাঁটতে পারতুম। দাদা, এর মূল্য, আমার কাছে অনেক—অনেক;—অমূল্য, মহামূল্য।

এইখানে লেখকের একটি প্রলাপ উক্তি পাঠিকা এবং পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। আমার জীর্ণকায় ছিন্নপত্র রোজনামচার পৃষ্ঠায় বারম্বার কদম কদম শব্দের উল্লেখ দেখিয়া অধুনা জনগণবন্দিত, সুভাষগঠিত আই এন্ এ'র সমর সঙ্গীতের প্রথম কলিটি আমার মনে পড়িতেছে।

কদম কদম বাড়ায়ে যা।
খুসী কে গীত গায়ে যা॥

চতুষ্পার্শের অন্ধকার হইতে ঝিঁঝির অশ্রান্ত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতেছে; দূরের, নিকটের, সম্মুখের, পার্শ্বের পাহাড়ের অন্ধকারের মধ্য হইতে শৈলগাত্রপরিশোভিত গৃহগবাক্ষবিনির্গত আলোকবিন্দুগুলি অন্ধ-আকাশে নক্ষত্রের মত খচিত হইয়া উঠিয়াছে; বারান্দার নীচের রমিত পুষ্পোদ্যান হইতে অতি মৃদু সুরভি—শীতল বায়ুর সঙ্গে কখনও কখনও ভাসিয়া আসিতেছে। অল্প আলোকে ও স্বল্প অন্ধকারে আমরা কিছুক্ষণ বসিয়া আছি, হঠাৎ সুভাষচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, কাউকে এখনও বলি নি, আজ আপনাকেই প্রথম বলছি, কলকাতায়

আমার একটা কংগ্রেস ভবন গড়বার ইচ্ছা আছে। কংগ্রেস হাউস্ নাম হ'লেও তাতে শুধু যে কংগ্রেসের কাজই হবে, তা নয়! আসলে হবে সেটা, জাতীয় বাহিনীর প্রধান শিবির! তার সঙ্গে থাকবে লাইব্রেরী, ষ্টেজ, জিমনেসিয়াম; কংগ্রেস আফিসও থাকবে বটে; কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি (Institutionটা) মূলতঃ সৈনিক কেন্দ্র হবে। অনেক দিন থেকেই প্ল্যানটা মাথায় আছে, এইবার কলকাতায় গিয়ে কাজ আরম্ভ করবো।

আমি বলিলাম, বললেনই যদি, আরও 'বিবরিয়া কহ শুনি ?'

সুভাষবাবু প্রশান্ত গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, অন্ততঃ এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের বাহিনী আমি এক কলকাতাতে, এক বৎসরের মধ্যেই গড়ে তুলতে পারবো ব'লে আশা করছি। হা-ডু-ডু খেলা থেকে তীর ধনুক চালানো, সেখানে সমস্তই শেখানো হবে। আমাদের দেশ যেদিন স্বাধীন হবে—হবেই একদিন—আর সে একদিন খুব দূর বলে আমি মনে করি না—সেদিন আমাদের এই প্রদেশে প্রদেশে গঠিত স্থায়ী জাতীয় বাহিনী দেশ রক্ষা করবে; দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রাখবে। কলকাতায় হবে, তার প্রথম প্রতিষ্ঠা!

আমার তখন কথা শুনিবার পালা, কথা বলিবার সময় নহে, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সুভাষচন্দ্র বর্দ্ধিতোৎসাহে কহিতে লাগিলেন, কলকাতায় কিছু করতে গেলে, কর্পোরেশনের সহায়তা ছাড়া করা যায় না। (মৃদু হাসিয়া) সেই জন্যেই কর্পোরেশনে আমার যাওয়া দরকার। যেতেই হবে, নৈলে নয়। আমার প্ল্যান তৈরী, ফাণ্ডের জন্য আবেদন প্রস্তুত, গিয়েই কাজ আরম্ভ ক'রে দিতে পারবো। তখন কিন্তু আপনাদের সাহায্য দরকার হবে, ফাঁকী দিতে পারবেন না।

আমি সহাস্যে কহিলাম—পাঠ্যাবস্থাতে সে সুনামটা খুব ছিল বটে;

এখন বোধহয় সে সুনাম কাটিয়ে উঠ্‌তে পেরেছি।

মৃদু হাসিয়া (হাসি সচরাচর মৃদু ছিল), সুভাষ কহিলেন, কলকাতায় কাজ সুরু ক'রে দিয়ে, প্রত্যেক প্রদেশে ঘুরে বেড়াবো (টুর করবো), প্রত্যেক প্রদেশে জাতীয় বাহিনীর কেন্দ্র তৈরী করতে হবে। ন্যূনপক্ষে একলক্ষ সৈনিক প্রত্যেক প্রদেশের 'কোটা'। আপনি হাসছেন নাকি? হাসছেন, হাসুন —কিন্তু তখন প্রশংসা না ক'রে পারবেন না, তা আমি বলে রাখছি।

তাহার পর বোধ করি বা রঙ্গ ভরেই কহিলেন, ভারতবর্ষের ১১টি প্রদেশে ১ লক্ষ ক'রে ১১ লক্ষ সৈনিক গড়ে উঠলে, সে কি আনন্দেরই হবে! না?

—আপনি কি আমাকে এতই ধৃষ্ট মনে করেন যে আমি ঐ কথাও অস্বীকার করবো?

—আপনাকে ধৃষ্ট বলতে পারি কখনও?—বলিয়া তিনি নীরব

পর মুহূর্ত্তে পুনরায় প্রদীপ্তকণ্ঠে কহিলেন, বড় জোর এক বৎসর। এই এক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেসের জাতীয়বাহিনী গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন দেখবেন—ভারতীয় জাতীয়বাহিনী জাতীয় সম্পদ ব'লে (an asset) দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

আজ ভাবি, একি দৈব বাণী? ভবিষ্যদ্বাণীর মতই উচ্চারিত হইয়াছিল? তবে এক বৎসর পরে নহে, ন্যূনাধিক আট বৎসর পরে, কংগ্রেসের বাহিরে, ভারতেরও বাহিরে যে বিরাট ভারতীয় জাতীয়বাহিনী সুভাষচন্দ্র গঠিত করিয়াছিলেন, পৃথিবীর স্বাধীনতা-কামী নর-নারীর চিত্তে কি শ্রদ্ধার স্বর্ণসিংহাসনেই না তাহা অধিষ্ঠিত হইয়াছে! সুভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ, সুভাষের ভারতীয় জাতীয়-

বাহিনীর নামটি জপমালা করিয়াছে বলিলেও বোধ করি বেশী বলা হইবে না। কামনার কুসুমকাননের সুরভিত শ্রদ্ধাকুসুম অবচয়ন করিয়া অপরিসীম বিস্ময়ের স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত মাল্য ভক্তিচন্দনবিলেপিত করিয়া, শুদ্ধান্তঃকরণে, সুনির্ম্মল করে জাতীয়-বাহিনীর কণ্ঠে দোলাইতে ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারী আজ লালায়িত। ভারতীয় জাতীয়বাহিনী ভারতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য লইয়াই ক্ষান্ত নহে, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা, আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর উদ্দীপনার বিদ্যুদ্দীপ্তিতে প্রভাসিত করিয়া নবীন ভারতবর্ষকে নবীন ছন্দে, নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহিতেছে। ভারতের জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সম্মিলিত কণ্ঠে জয় হিন্দ্ গাহিতেছে। ভারতের ইতিহাসে এমন ভাব-সাম্য অভিনব এবং অতুলনীয়।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরব। আমি অন্ধকার ধরণীর পানে চাহিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছি, অকস্মাৎ সুভাষচন্দ্রের মধুর-গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

—"একটি ভাল দিনক্ষণ দেখে 'জয় মা' বলে নেমে পড়ি। কি বলেন?" (সুভাষচন্দ্র কি শাক্ত, কালী-মা ভক্ত? এ মা কোন্ মা? জগজ্জননী মা, না জননী-জন্মভূমি মা? আরও একটি কথা। সুভাষবাবু পাঁজি পুঁথি যাত্রা অযাত্রা মানিতেন, তাহার সাক্ষী আমার এই দুই কর্ণ।)

তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছিলাম, আদৌ দিয়াছিলাম কি-না মনে নাই। বোধ করি উত্তর দিই নাই। অপাত্রে প্রশ্ন এবং উত্তর অনাবশ্যক বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলাম।

সুভাষচন্দ্র কহিলেন—'জয় মা' বলে দিই সুরু করে!

আবার—'জয় মা'!

গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী প্রকাশ হইয়া জানাইলেন, আহার্য্য প্রস্তুত।

আমরাও অপ্রস্তুত ছিলাম না, সভা ভঙ্গ হইল।

এইখানে সুভাষচন্দ্র পরিকল্পিত কংগ্রেস- ভবনটির কথা বলি। ১৯৩৮ সালের আগষ্ট (!) মাসে কলিকাতায় একটি "জাতীয় ভবন" ("কংগ্রেস ভবন") নির্ম্মাণের প্রস্তাব কর্পোরেশনের সভায় প্রথম আলোচিত হয়। চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপরে বৃহৎ একখণ্ড জমি ৯৯ বৎসরের জন্য নামমাত্র, বার্ষিক এক টাকা খাজনায় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে জমা দিবার প্রস্তাব, মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির বিরুদ্ধতা ব্যর্থ করিয়া কর্পোরেশন কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। এই জমির উপরে সুভাষচন্দ্র সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেন। তন্মধ্যে একটি রঙ্গালয়, একটি বক্তৃতামঞ্চ, একটি বহুগ্রন্থ সম্বলিত পুস্তকাগার, একটি বৃহৎ ব্যয়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রস্তাবনায় এই কথাগুলি বলা হইয়াছিল। সহর ও সহরবাসীর স্বাস্থ্য, জ্ঞান, চিত্তরঞ্জন বিষয়ক কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রস্তাবটি সাদরে গৃহীত হয়। কথা ছিল, প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যালয়ও ঐ ভবন মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে। তখন পর্য্যন্ত কংগ্রেস-হাউস নামেই ভাবী ভবনটির পরিচিতি হইয়াছিল।

১৯৩৮ সালের সে কথা; আজ ১৯৪৬। ইত্যবসরে দীর্ঘ আটটি বৎসর বিগত হইয়াছে। কিন্তু কোথায় সেই কংগ্রেস ভবন? সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা কি তাঁহার কল্পলোকেই রহিয়া গেল? কলিকাতা সহরে যে কয় লক্ষ লোক বাস করেন, তাঁহারা ঐ প্রশ্ন না করিতেও পারেন, কিন্তু কলিকাতাই বঙ্গদেশ নহে এবং বঙ্গদেশই ভারতবর্ষ নহে। ভারতবর্ষ জানিতে চাহিতে পারে, সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস-ভবন এই দীর্ঘকালের মধ্যেও রূপায়িত হইল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিব এবং বলিব যে কল্পলোকে নহে, এই মর্ত্ত্যলোকেই তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশাল বঙ্গদেশ ও বিরাট ভারতবর্ষের নিকট সানুনয় নিবেদন, ভবন আমি

দেখাইব। উদ্ধত উন্নত উচ্চ শিরে নহে—লজ্জাবনত মস্তকে সঙ্কোচ-ধিক্কৃত ধীর পদে আসিতে হইবে, আমিও নতশিরে পথ প্রদর্শন করিব। দেখিয়া লজ্জায় হতবাক্ হইতে হয়—হইবেন; জাতির জীবনে ধিক্কার জাগে, উপায় নাই!

নামটি এখন আভাসেই বলিয়া রাখি—মহজাতি সদন। পরবর্ত্তী স্তরে ইতিহাস বিবৃত করিব।
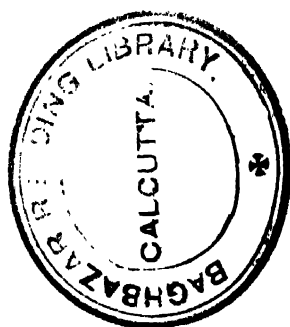
তৃতীয় স্তর—কীটপতঙ্গ

এই ইতিহাস কলঙ্ক ও বেদনার ইতিহাস। ১৯৩৯-৪০ সাল বিগত। মাঝখানে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। সে ভীষণ দুর্য্যোগে বঙ্গদেশ, তাই বা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতি বিপর্য্যস্ত—পর্য্যুদস্ত। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজী কর্ত্তৃক কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত (মনোনীত?) হইয়াছিলেন। আমাদের মনে আছে এই বৎসর, সর্ব্ববয়ঃকনিষ্ঠ সভাপতি সুভাষ-চন্দ্রকে গান্ধীজী রাষ্ট্রপতি সম্বোধনে সমাদৃত করিয়াছিলেন; তদবধি রাষ্ট্রপতি অভিধানটিই সুপ্রচলিত। ১৯৩৯ সালে, সুভাষবাবু গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের উচ্চমণ্ডলের মতের বিরুদ্ধে পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদ অধিকারের চেষ্টা করেন এবং নির্ব্বাচনে, হাইকম্যাণ্ডের দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়লাভ করেন। উচ্চমণ্ডল-সহিত গান্ধীজীর পরাজয় এবং সুভাষচন্দ্রের বিজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উচ্চমণ্ডলের ধীরমন্থর গতির বিরুদ্ধে দেশের জনমত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল এবং একটা বিশাল ও বিস্তৃত অংশ সুভাষচন্দ্রের অধীর, অস্থির ও দ্রুত গতিকেই পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক গতি মুক্তির প্রকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করিতেছিল। সংখ্যায় তাহারাই অধিক, সেই সংখ্যাধিক্য সুভাষকে জয়মাল্য দান করিয়াছিল। গান্ধীজী মনোনীত 'শ্লথগতি' প্রবীণ পট্টভি সীতারামিয়ার পরিবর্ত্তে, ঝঞ্ঝাগতি নবীন সুভাষচন্দ্রের জয়ের এতদ্ভিন্ন অন্য কারণ থাকিতে পারে না। গান্ধীজী স্বয়ং এই পরাজয়কে তাঁহার ব্যক্তিগত পরাজয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

১৯১৯ এবং তৎপরবর্ত্তীকালে—আজ পর্য্যন্ত, কংগ্রেস বলিতে গান্ধীজী এবং গান্ধীজী বলিতে কংগ্রেসকেই বুঝাইত এবং বুঝায়; সুতরাং এই পরাজয়ে উভয়েরই পরাজয় ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তথাপি গান্ধীজী কেন যে "ব্যক্তিগত পরাভব" শব্দ সমষ্টির উপর জোর দিয়াছিলেন, তাহাও সহজেই অনুধাবন করিতে পারা যায়। গান্ধীজীর অভ্রভেদী প্রভাব যে খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে, এই সত্য সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হইয়াছিল। নব্য ভারতের কংগ্রেসের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা অভাবিত ও অভূতপূর্ব্ব। একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্যতিরেকে, এই ভারতবর্ষে, গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবকে কোনও দিন, কোনও লোকই দ্বন্দ্বে আহুত করিতে সাহস পায় নাই। দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা গান্ধীজীকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে সত্য; কিন্তু বহু চিন্তা, বহু গবেষণা, বহু দ্বিধা, বহু সঙ্কোচের পর—একেবারে মরিয়া হইয়া তবে তাহা পারিয়াছে। অনেক সময়ে সাহসে কুলায় নাই বলিয়া একটির পর একটি মারাত্মক ভুলও করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'চৌরী চারা' নাটকে গান্ধীজী স্বয়ং হিমালয়সম ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার পর প্রবল প্রতাপ বৃটিশ সরকার তাঁহার 'অঙ্গস্পর্শ' করিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, বৃষ্টির মধ্যে বৃক্ষারূঢ় কপি দল যেমন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে, দলবলসহ দিল্লীশ্বরও তেমনই বসিয়াছিলেন; অঙ্গুলিটি পর্য্যন্ত উত্তোলন করিতে সাহস হয় নাই। গান্ধীজীর পবিত্র চরিত্র মাহাত্ম্য, তাঁহার ব্যক্তিত্বকে বৃটিশেরও আয়ত্তের অতীত করিয়া রাখিয়াছিল। অন্যায় করে নাই। পুরাণ কোরআন্, বাইবেলের বাহিরে এমন পবিত্র চরিত্র মানব কে, কবে ও কোথায় দেখিয়াছে? সুদীর্ঘকাল পরে একজন শক্তিমান ভারতীয় সেই গান্ধীকেই চ্যালেঞ্জ করিয়া বসিল। চ্যালেঞ্জ করাই ত অপরাধ—যুদ্ধে জয়লাভ করা মহা অপরাধ—অমার্জ্জনীয় অপরাধ! গান্ধী-ভারতবর্ষ যেন বিহারের ভূমিকম্পে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সে কালের সুরাট-কংগ্রেসের দক্ষ-যজ্ঞ, একালের দক্ষ-যজ্ঞের তুলনায় কিছুই নহে। ইদানীং কালের কংগ্রেসে এমন কাদা
দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল, এ কথা আমি অসঙ্কোচে লিখিয়া রাখিতে পারি।

পরবর্ত্তী কাহিনী অত্যন্ত বিরস ও তিক্ত। এতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে গান্ধীজী মহামানবের প্রাপ্য পূজা পাইতেন, এখন হইতে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যে পদে পদে পূজার অঙ্গহানি ঘটিলেও বাঙ্গালীর মনস্তাপ জন্মিল না।

১৯৩৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশন হইল, জব্বলপুর সন্নিকটস্থ ত্রিপুরীতে। কংগ্রেসে না আসিয়া গান্ধীজী সেই সময়ে রাজপুতানার রাজকোট নামক এক ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের শাসন সংস্কার সম্পর্কে রাজ্যের সীমান্ত দ্বারের লৌহ দ্বারে মাথা খুঁড়িতে সুরু করিয়া দিলেন; আর তাঁহার অনুচরবর্গ—উচ্চমণ্ডল—ত্রিপুরীতে অভিমন্যু-বধের পুনরভিনয়ের আসর পাতিলেন। আচার্য্য দ্রোণ যে চক্রব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু তন্মধ্যে প্রবেশ-পথ জ্ঞাত ছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ নির্গমণ পন্থা তাঁহার জানা ছিল না; সপ্তরথী মিলিয়া বীর বালককে বধ করিয়াছিল। ত্রিপুরীতে ব্যূহ নির্ম্মাণের ভার পড়িয়াছিল, গোবিন্দবল্লভজীর উপর। তাঁহার দক্ষতার অভাব ছিল না; তবে ত্রিপুরীর অভিমন্যুর, আগমন ও নিষ্ক্রমণ—দু'টি পথই জানা ছিল—অক্ষত না হোক, ক্ষত বিক্ষত দেহে ব্যূহভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিসদৃশ আবহাওয়া এতই দুষ্পাচ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে আমার মনে আছে, আমি আমার দুইজন রাজনৈতিক বন্ধু সমভিব্যাহারে ত্রিপুরী পরিহরি বহুবারদৃষ্ট নর্ম্মদার জলপ্রপাত ও মদনমহল দর্শনও স্বাস্থ্যকর বিবেচনা করিয়াছিলাম। ত্রিপুরীর তুলনায় মর্ম্মরমণ্ডিত নর্ম্মদার জলকল্লোল স্বাদু ও হৃদ্য বোধ হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্রকে চিরকাল প্রবল ও সবল জননায়করূপেই আমি (আমরা সকলেই) দেখিয়াছি, কিন্তু এই সময়ে যে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা তখনকার দিনে বহু বাঙ্গালীকে ব্যথিত করিয়াছিল। কংগ্রেসের একটি কর্ম্ম পরিষদ আছে, সাধারণতঃ ওয়ার্কিং কমিটি নামে খ্যাত। সদস্য সংখ্যা ১৩ কিম্বা ১৫। সভাপতি সদস্য নির্ব্বাচন (মনোনয়ন) করিয়া থাকেন। সুভাষচন্দ্র ইচ্ছা করিলে তাঁহার কর্ম্ম পরিষদ গঠন করিতে পারিতেন, করা তাঁহার উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ গান্ধীজীর আশীর্ব্বাদ ও উচ্চমণ্ডলের সহযোগিতা যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। কলহ আবর্ত্তিত আবহাওয়ায় ঐ দুইটি বস্তুই—অপ্রাপ্য না হইলেও, দুষ্প্রাপ্য, সকলেই তাহা জানিত; সুভাষচন্দ্রও যে না জানিতেন, এমন নহে। তথাপি কেন যে তিনি স্ব-মনোনীত কর্ম্মী লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে বিরত রহিলেন, বুঝি নাই। ত্রিপুরীর সপ্তরথী-রচিত দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া যখন সুভাষচন্দ্র, জামাডোবায় তাঁহার অন্যতম অগ্রজের (শ্রীযুত সুধীর বসুর) গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সেইখানে এক সুদীর্ঘ পত্রে ঐ পরামর্শ দিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেও আমাদের বাধে নাই। কয়েকদিন পরে কার্সিয়ঙের গিধা পাহাড়ে পরম শ্রদ্ধেয় (মেজদা') শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর পার্ব্বত্য বিরাম-মন্দিরে চা 'বৈঠকে', শরৎবাবুকেও আমি সাধারণ (অর্থাৎ আমাদের মত গোলা) বাঙ্গালীর বাসনা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম। কিন্তু না, কাল-বৈশাখী অত্যাসন্ন গতি রোধে কাহার সাধ্য?

এইখানে এবং এই প্রসঙ্গের অভ্যন্তরে, সুভাষচন্দ্রের "Strange illness"—সন্দেহজনক অসুস্থতার কথাটা আমি বলিয়া রাখিতে চাহি। ত্রিপুরীতে রাষ্ট্রপতি অসুস্থ ছিলেন; কিন্তু গান্ধী-কংগ্রেস এই অসুস্থতা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ইহাকে রাজনৈতিক অসুস্থতা বোধে হাসি-ঠাট্টার বিষয়ীভূত করা হইয়াছিল। সুভাষবাবুর কাণে সংবাদ

পৌঁছিয়াছিল এবং তাহারই অব্যবহিত ফলস্বরূপ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "মডার্ণ রিভিউ" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রে তাঁহার লিখিত "ষ্ট্রেঞ্জ ইলনেস্" প্রবন্ধের প্রকাশ।

অমোঘ অদৃষ্ট—যাহাকে আমরা নিয়তি বলি—কেমন কদমে কদমে সুভাষচন্দ্রকে দূর হইতে দূরান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তখনকার দিনে তাহা দুর্নিরীক্ষ থাকিলেও, এখন চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। নিয়তির বিধান যে অখণ্ডনীয়, অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা অস্বীকার করিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই। অদৃষ্টে অবিশ্বাসী লোকের অভাব পৃথিবীতে নাই, স্বীকার করি। তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন, পরবর্ত্তী ঘটনা পরম্পরার গতি প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, অমোঘ অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় সন্দেহের আমূল অবসান ঘটিবে; ঝড়ে আপন ঘরখানি উড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই না সুভাষচন্দ্র সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া মহাদেশকেই আপনার ঘর করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন? ভারতীয় কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছিল বলিয়াই না ভারত সীমান্তের পারে, অভিনব এবং অভাবনীয় "কংগ্রেস" সৃজিত হইতে পারিয়াছিল। পৃথিবীর যে ইতিহাস রচিত ও পঠিত হইয়া থাকে, আর যে ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই, ভবিষ্যকালের নরনারী যে ইতিহাস পাঠ করিবার ভরসা রাখেন, তাঁহাদিগকে আমি ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ইতিবৃত্তের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাধ্য। অদৃশ্য, অদৃষ্ট নিয়তি ও প্রবল পুরুষকার যেন অভিন্নহৃদয় সুহৃদ—সঙ্গের সাথী হইয়া সুভাষের সঙ্গে পথে প্রান্তরে অরণ্যে, রণে, বিজয়ে, পরাজয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। এমন অন্ধ কে আছে যে তাহা দেখিতে পায় না? অনাগত কালের জাতীয় ইতিহাসবেত্তার অবগতির জন্য, আজ অবান্তর হইলেও একটা কথা এইখানে বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। কংগ্রেস, আত্ম-কলহে, গৃহবিবাদে পূর্ণমাত্রায় নিয়োজিত হওয়ায়

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এদেশে ও বিদেশে যে কতখানি আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা গোপন থাকে নাই। গান্ধী ও উচ্চমণ্ডল এই সময়ে "ভাল ছেলে" এবং সুভাষচন্দ্র ও ফরওয়ার্ড ব্লক "বদ ও বেতামিজ" হইয়া উঠিয়াছিল। তবে সুভাষ যে এনিমি নম্বর ওয়ান্‌ তাহা আগেও স্বীকৃত, এখনও স্বীকৃত।

কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের বৃহত্তর পরিষদের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের পতন ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভ্যুত্থান। তৎসঙ্গে "বন্দেমাতরম"-এর অঙ্গচ্ছেদ। দুইটার কোনটাকেই বাঙ্গালী সুস্থচিত্তে অথবা সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতীটাই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে, আজ স্মরণ করিতেও দুঃখ ও লজ্জা হয় যে ক্ষোভের আধিক্য অত্যন্ত অশোভন হইয়া অতিথিপরায়ণ বঙ্গদেশের শুভ্র অঙ্গও দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমায় মসীবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মর্ম্মান্তিক পরিতাপ এই যে, মহান্‌ হইতে মহীয়ান্‌ মহাত্মা গান্ধীকেও ক্ষোভাগ্নির উত্তাপ স্পর্শবিরত হয় নাই। অগ্নি চিরদিন অন্ধ! এই দৃষ্টিহীন অন্ধ অগ্নি বহুদিন ধরিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং সুভাষচন্দ্র পরিকল্পিত সেই কংগ্রেস ভবনটিও এই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেল।

জমি পাওয়া গিয়াছে, আগেই বলিয়াছি। কর্পোরেশনে সুভাষের ভক্তবৃন্দ প্রস্তাব করিলেন, ঐ জমিতে গৃহনির্ম্মাণ কল্পে নগদ একলক্ষ টাকা সুভাষকে দেওয়া হৌক। কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্রের অমিত প্রতাপ। সামান্য বিরোধিতা বার্থ করিয়া, প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল; কিন্তু টাকা বাহির হইল না। কেন, তাহা বলিতেছি।

পাঠিকা ও পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিতেছেন যে ঠিক নয় মাস পূর্ব্বে, ডালহাউসী পর্ব্বতে বসিয়া সুভাষচন্দ্র যে পরিকল্পনা আভাষে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ব্লু প্রিণ্টে—বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ

করিতে উদ্যত হইয়াছে। হা মোর দুর্ভাগা দেশ, মহোচ্চ পরিকল্পনার কি শোচনীয় পরিণতি !

কর্ম্মবীর ও স্বদেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের তেজস্বিতায় ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া কর্পোরেশনের সভায় যাঁহারা লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়া দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কয়েক ঘণ্টা পরে, তাঁহারাই অনেকে দল বাঁধিয়া, ঘোট পাকাইয়া প্রস্তাবটিকে পণ্ড করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া, কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার শরণ লইলেন,—লাখ না হয় ফাঁক। তাঁহাদের কাজটা নিশ্চয় নিন্দার্হ। কিন্তু কারণও কিছু ছিল ; একেবারে অকারণ বলিতে পারি না। ডালহাউসী (পাহাড় নহে, পুকুর) তটোপরি অবস্থিত অট্টালিকাভ্যন্তরে চিরবিদ্যমান জুজুর ভয়ে অনেকের হৃদয় বিকম্পিত ছিল। জুজুর ভয় কবে, কোথায় বা কাহার নাই ? তখনকার মন্ত্রিবর্গের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইলেও, মন্ত্রিমণ্ডলের মনিবদের চর্ম্ম চিরদিন শ্বেতবর্ণ। বিশ্ববিধাতার বিশ্ববিধানে বিধি এই যে, শ্বেত আদেশ দিবে, কৃষ্ণ পালন করিবে। গোরোচনা গৌরী মান করিবে, কৃষ্ণকায় কৃষ্ণ মানভঞ্জনের পালা গাহিবে। কৃষ্ণকায় পরিচালিত কৃষ্ণবর্ণ কর্পোরেশনের উপর শ্বেতবর্ণের নীল নয়ন কোনদিনই প্রসন্ন ছিল না। কাণাঘুষায় রটিল যে শ্বেত, কালো মাথায় মাথট বসাইয়া 'লুণ্ঠিত' লক্ষ মুদ্রা পুনরুদ্ধারে দৃঢ় সঙ্কল্প। "অমন অবস্থায় পড়লে অনেকেরই মত বদলায়।"

আর একটা গৌণ কারণও ছিল। সুভাষের রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের পর হইতে, সগান্ধী কংগ্রেসের উচ্চমণ্ডলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের যে ঘূর্ণিবাত্যা, বঙ্গদেশকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, তাহার প্রবল বেগ তখনও মন্দীভূত হয় নাই। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়া, পুরাণের বিশ্বামিত্র ঋষির অনুসরণে নবীন কংগ্রেস গঠন করিয়াছেন, নাম দিয়াছেন, ফরওয়ার্ড ব্লক। নব্য কংগ্রেসের চেলা চামুণ্ডারা বৃদ্ধ কংগ্রেসকে হাড়গোড় ভাঙ্গা দ' করিয়া

ফেলিয়া তবে ক্ষান্ত ও শান্ত হইবে, বাজার এমন গরম। প্রাদেশিকতার ভূতপ্রেত দক্ষযজ্ঞান্তে নন্দীভৃঙ্গীর মত তাণ্ডবে ধূয়া-নাচ নাচিতেছে। বিশেষ করিয়া প্রাদেশিকতার ভূতটি বাঙ্গলার স্কন্ধে আর প্রেত মহোদয় বিহারের ঘাড়ে চড়িয়া বসিয়াছেন। ঢিলের আঘাত ও পাটকেলের প্রত্যাঘাতে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলা দেশ হইতে গালাগালির যে গ্যাস ছুটিতেছিল, নিতান্তই গ্যাস-প্রুফ বলিয়া গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ সে যাত্রা পরিত্রাহি ডাকিয়াই বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। নতুবা নিধন নিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার এই কথাগুলি অত্যন্ত রুক্ষ, অতীব কঠোর ও যৎপরোনাস্তি রূঢ় হইলেও, ইহার প্রত্যেকটি বর্ণে বর্ণে সত্য। সেদিনের সেই প্রাদেশিকতার অবসান হওয়ায় আজ আবার শান্তির সুবাতাস উপভোগ করিতে পারা যাইতেছে বটে; কিন্তু সেদিন, ঐ তুইটি প্রদেশেরই বায়ুমণ্ডল বিষম ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র ছিল না। কর্পোরেশনে এক দল লোক সেই ধূয়া ধরিয়া ফেলিল; বলিল, রাধাও নাচিবে না, তেলও পুড়িবে না অর্থাৎ লক্ষ টাকায় জাতীয় ভবনও হইবে না, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীও—হইবে না, টাকাগুলি গান্ধী-মারণ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতেই শেষ হইয়া যাইবে!

তাহারা আইনের প্যাঁচে ফেলিয়া চীফ্‌কে আটকাইয়া দিল। গভীর রাত্রে, ক্যামাক ষ্ট্রীটে চীফের ভবনে আসিয়া, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সাধ্যসাধনা-রোষক্ষোভ সমস্তই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। আমাদের স্নেহভাজন কাউন্সিলার শ্রীমান সুধীর রায়চৌধুরী, বিজয়সিং নাহার, মৃগেন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সুভাষ ভক্তগণও ব্যর্থ-মনোরথ হইলেন। শেষ চেষ্টা হিসাবে তাঁহারা সুভাষচন্দ্র ও চীফের সাক্ষাৎ আলাপের ব্যবস্থা করিলেন। যেদিন প্রভাতে 'গুহক মিলন' হইবে, সেইদিন অতি প্রত্যুষে, কাক-কোকিল শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, আমার ঘরের টেলিফোনের ঘণ্টা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। সুভাষ-

চন্দ্রের টেলিফোন। কতকাল পরে! সুভাষচন্দ্র স্মরণ করিয়াছেন কিন্তু আনন্দে নিরানন্দ। তাঁহাকে সে কথা বলিলাম।

সুভাষচন্দ্র বলিলেন, তা বললে হবে না, টাকাটা চাই। মিঃ মুখাৰ্জ্জি আমার এখানে আসবার আগে আপনি তাঁকে বলুন। —ডালহাউসী পাহাড়ে সাহায্য করবেন, প্রতিশ্রুত ছিলেন, ভুলে গেছেন?

ভুলি নাই! ভুলি নাই!!

কিন্তু হাতী ঘোড়া উট সব তলাইয়া গিয়াছে, মশা পারিবে জল মাপিতে? মিঃ জে-সির মত বন্ধুবৎসল বন্ধু বিরল এবং আমার সৌভাগ্যক্রমে সুদীর্ঘকাল (আজ পর্য্যন্ত) আমার এই উচ্চহৃদয় সুহৃদের নিরবচ্ছিন্ন স্নেহসম্ভোগের সুযোগ হইলেও, কর্পোরেশনের ব্যাপারে, যেখানে রাজায় রাজায় যুদ্ধ, সেখানে উলুখাগড়ার করণীয় কিছু থাকিতে পারে না জানিয়াও, কাঠবিড়ালীর ভূমিকা অভিনয় করিতে পশ্চাদপদ হওয়াটা ভাল মনে হইল না। কিন্তু আমি ত তৃণাদপি তুচ্ছ ও সুনীচেন, স্বয়ং সুভাষচন্দ্রকেও ব্যর্থ হইতে হইয়াছিল। জে-সিরও—ইহা আমি বলিতে বাধ্য, দোষ ছিল না। কর্পোরেশনের প্রায় চল্লিশজন সদস্য লিখিতভাবে তাঁহাকে অনুরোধ (অর্থাৎ নির্দ্দেশ, কেন না, তাঁহারাই মনিব!) করিয়াছিলেন, ঐ লক্ষ টাকা খয়রাতি প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য তাঁহারা বিশেষ সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সভাধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত চীফ যেন টাকা না দেন। জে-সি সুভাষবাবুর গৃহে চা খাইতে খাইতে সেই কথাই বলিলেন।

—'এই অনুরোধ পত্র প্রত্যাহার করাইয়া দিন, অথবা তাহা হইতে গোটা কুড়ি নাম উঠাইয়া লইবার ব্যবস্থা করুন, আমি চেক্ দিবার আদেশ দিতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিব না।'

ইহা সম্ভব হয় নাই। ইত্যবসরে হাইকোর্ট ইঞ্জাংসন দিয়া বসিল।

আশা অতলে ডুবিল।

সুভাষচন্দ্র কিন্তু তাহাতেও দমিলেন না। তাঁহার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। অথচ হাত প্রায় রিক্ত; অর্থ নাই বলিলেও চলে। একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশের অনুজ প্রফুল্লরঞ্জন-প্রতিশ্রুত ত্রিশহাজার টাকাই সম্বল; কিন্তু তাহাতে ভীত হইবার হৃদয় সুভাষের নহে; সারাজীবন 'আগে চল, আগে চল' তাঁহার জীবন-মন্ত্র। শূন্য হস্তে কিন্তু আশা-পূর্ণ হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপনায় উদ্যোগী হইলেন। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করিতে আসিয়া ভবনটির নামকরণ করিলেন, মহাজাতি সদন; "A house of the Nation."

আজও চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপর কবিদত্ত নাম ও বিশাল সৌধের কঙ্কালখানি বক্ষে ধারণ করিয়া সুভাষের মহাজাতি সদন পথচারীর মনে অতীতের করুণ স্মৃতি জাগাইবার জন্য বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতেছে।

একদিন সুভাষ, তাঁহার নিজের দেশে,—যে দেশ তাঁহার কর্ম্ম, মর্ম্ম ধর্ম্ম, যে দেশ তাঁহার ধ্যান, ধারণা, সাধনা,—এক লক্ষ টাকা চাহিয়া চাহিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পান নাই; চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র আশাহত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল; কয়দিন পরে, তাঁহার গলার মালাখানি—চার আনা, আট আনা মূল্যের মালাখানি বার লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল! স্বদেশে একলক্ষ টাকার জন্য এত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, কয়দিন পরে এক বক্তৃতা-সভায় আট কোটী টাকা তাহারই পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি পড়িয়াছিল। পৃথিবীর কি বিচিত্র গতি!

সেদিনের সেই বিফলতা, সেই ব্যর্থ প্রয়াস যে কিছুকাল পরে শত সহস্র গুণ বলশালী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে কথা আজ আর কাহার অবিদিত? কলিকাতা মহানগরীর মহাজাতি সদন ঘটনাচক্রে কঙ্কালই রহিয়া গেল, কিন্তু দেশান্তরে, ক্ষেত্রান্তরে,

প্রকারান্তরে যে মহাজাতি সঙ্ঘ সৃজিত হইয়া ভারতের স্থলজলগগন প্রকম্পিত করিয়া তুলিল, কোমল ও করুণ কণ্ঠের সাম গানকে চিরবিদায় দিয়া সমর সঙ্গীতে বৃহত্তর ভারতের নদনদী নগরনগরী গিরিপর্ব্বতরাজি প্রতিধ্বনিত করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে নব নব অধ্যায় সংযোজন করিয়া দিল, তাহার তুলনা কোথায় ?

ইতিহাস শিবাজীকে দস্যু সর্দ্দার চিত্রিত করিয়াছে; সিরাজদ্দৌলাকে লম্পট নরঘাতকরূপে অঙ্কিত করিয়াছে ; সুভাষচন্দ্র ও সুভাষ-সৃষ্ট আই-এন্-একে পরস্বাপহারী নরপিশাচ জহ্লাদ করিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় না করিলেই বিস্ময়ের বিষয় হইত। ইতিহাসের এই মূল্য !

ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে, বৃহত্তর এসিয়া খণ্ডে ভারতের সকল প্রদেশের সকল জাতিবর্ণধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নরনারী সমন্বয়ে সেই যে মহাজাতির গান সুভাষচন্দ্র রচিয়াছিলেন, আমরা আজ যাহা স্বকর্ণে শুনিয়া ধন্য হইতেছি, আমাদের পরে, আমাদের বংশধরগণ তাহা শুনিয়া চরিতার্থ হইবে এবং তাহারও পরবর্ত্তীকালে, যুগযুগান্তে, শতাব্দীর শেষে যে অনাগত জাতি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাও তাহা শুনিয়া গৌরববোধ করিবে। ইতিহাসের হেন সাধ্য হইবে না যে তাহার বিলোপসাধন ঘটায়।

সুপ্তিহীন স্তব্ধ নিশীথে অন্ধ আকাশের পানে চাহিয়া প্রহরের পর প্রহরের অবসানে চিন্তার রশ্মি যখন অসংযত বেগে অন্তহীন অনন্তের পানে প্রধাবিত হয়, তখন সুভাষচন্দ্রের অপরিম্লান গৌরবদীপ্ত সাফল্যের বিরাট ব্যর্থতার তুলনায়, আমাদের অসীম শক্তিশালী কংগ্রেসও যেন স্কুল কলেজের ডিবেটিং ক্লাবের মত ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। চন্দ্রমা ও খদ্যোতের উপমাটাই মনে করাইয়া দেয় ! কংগ্রেসের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা অথবা আনুগত্যের অভাব নাই। ভারত মহাসমুদ্রের বালু বেলায় কংগ্রেসের সংখ্যাহীন, অগণিত ভক্তের মাঝে লেখকও একটি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বালুকণা—সাগর সৈকতে সবই বালি, সেখানে ভেজালের

স্থান নাই। আজিকার ভারতবর্ষে কংগ্রেস যাহার হৃদয়াসন অধিকার করিতে না পারিয়াছে, হয় তাহার হৃদয় নাই, না হয় তাহার হৃদয় ব্যাধি-বিধ্বস্ত ; রোগাক্রান্ত হৃদয়ের স্পন্দন ও অনুভূতি অসাড় ও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তথাপি একথা না বলিয়া ত পারি না যে সুভাষচন্দ্র অনাগত জাতির সম্মুখে অনন্তকালের জন্য অনাগত অনন্তকাল সমীপে যে বজ্রগর্ভ বাণী প্রেরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনায় সবই ম্লান, সমস্তই ধূসর।

হিংসা অহিংসার দ্বন্দ্ব, অস্ত্রযুদ্ধ অথবা সত্যাগ্রহের কলহ ভারতবাসীর চিত্ততলে বহুকাল যাবত যে অন্তর্বিরোধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে সুভাষচন্দ্রের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি তাহাদেরও মূক ও স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। পথের কলহানল নির্ব্বাপিত করিয়া দুর্নীরিক্ষ্য লক্ষ্যকেই প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কে কোন্ পথ ধরিয়া, কোন্ যানবাহনে আরোহণ করিয়া, দূর লক্ষ্যে পৌঁছিবে, সে তর্কবিচার আজ অতীত হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্য এবং লক্ষ্যবেধের প্রশ্নই আজ একমাত্র প্রশ্ন। যেন নীল-নির্ম্মল নভোমণ্ডলে মধ্যাহ্ন সূর্য্য।

সুভাষচন্দ্র জীবিত অথবা লোকান্তরিত, কেহ জানে না। আই-এন্ এর দৃঢ় বিশ্বাস, সুভাষচন্দ্র জীবিত ; গান্ধীজী বলেন, সুভাষের জন্য নীরবে প্রার্থনা কর ; সুভাষচন্দ্রের দেশবাসী মনে করে, পরাধীন ভারতের চিরজাগ্রত আত্মার মত ভারতের মুক্তিকামী সুভাষচন্দ্র মৃত্যুঞ্জয়ী, অবিনশ্বর। কিন্তু জীবিত অথবা মৃত, কিছু আসে যায় না। গ্যারিবল্ডি কি মরিয়াছেন ? শিবাজী কি মৃত ? রাণা প্রতাপসিংহ চিরদিন অমর। জর্জ্জ ওয়াসিংটনের বিনাশ নাই। সুভাষচন্দ্রও চিরজীবী। শুধু ভারতে নয়, শুধু এসিয়ায় নয়, পৃথিবীর যেখানে যে দেশে, যে কোণে যে পরাধীন জাতি আছে, সেইখানে, সেই দেশে, সেই মানবসমাজের প্রত্যেকটি নরনারী সুভাষচন্দ্রের নামের পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইবে। যে সঙ্গীত একদিন বীর

সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত বীরকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল, পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী নরনারীর সম্মিলিত কণ্ঠে আমরা সেই সঙ্গীত ধ্বনিত হইতে শুনিতেছি। ঐ শোন সেই গান ঃ

"ঐ দূরে—অতি দূরে, ঐ নদীর ওপারে, ঐ পর্ব্বতমালার পরপারে ঐ ঘন বনানীর অপর পারে— ঐ দেখা যায় আমাদের মাতৃভূমি—আমাদের সাধনার মহাতীর্থ—আমাদের ভারতবর্ষ—আমাদের কামনার ধন, আমাদের বাসনার স্বর্গ, আমাদের আরাধনার নন্দনকানন, আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। একদিন আমরা ঐখান হইতে এই সুদূরে আসিয়াছিলাম। আবার আজ আমরা সেইখানে ফিরিয়া যাইব। ঐ শোন ভারতবর্ষের আবাহন, ঐ শোন জন্মভূমির আহ্বান! কি মধুর, কি স্নেহপবিত্র সে আবাহন। ঐ শোন। চলো……"

জাগ্রত ভারত অনন্তকাল ধরিয়া উৎকর্ণ হইয়া ঐ গান শুনিবে।

চন্দ্রমা-আকর্ষিত সাগর জলের মত উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ঐ গান মানব-হৃদয় আলোড়িত করিবে।

বন্দে মাতরম্।

জয় হিন্দ।
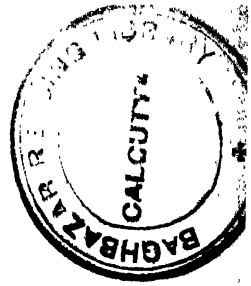
চতুর্থ স্তর—অনাবৃষ্টি

আমার স্মরণ আছে আমি একবার কথাপ্রসঙ্গে ভিটলভাই প্যাটেলের উইলের প্রসঙ্গটা উত্থাপিত করিয়াছিলাম। মহাজাতি-সদনে যেমন, এই উইলের ব্যাপারেও তেমন, সুভাষচন্দ্রকে ব্যর্থতা বরণ করিতে হইয়াছিল। এই দুইটি ব্যাপার ব্যতীত আর কোন কার্য্যে তাঁহাকে ব্যর্থ হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।

পুনরায় একটা ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিতে হইতেছে। সুভাষ-চন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র ভারতবর্ষে সুবিস্তৃত। রাজনৈতিক কার্য্য, পৌরসভা-সম্পর্কীয় কার্য্য, শ্রমিক সঙ্ঘটন, ছাত্র সঙ্ঘটন কত কার্য্যই তাঁহার ছিল। আমার পক্ষে সকল কার্য্যের সংবাদ রাখা সম্ভব নহে। ইহা আমি স্বীকার করি। এবং তাঁহার কার্য্যকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকিবার কণামাত্র গৌরব দাবী না করিতে পারিলেও, শ্রদ্ধার সহিত, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত দৃষ্টি রাখিতে পারিয়াছি বলিলে অন্যায় অথবা অত্যুক্তি হইবে না। আমার বিশ্বাস, আমার বর্ণিত কাহিনীতে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে তাঁহার যে কার্য্যসূচি ও কর্ম্মপঞ্জী আমি দিয়াছি, তাহার প্রামাণ্যতা অস্বীকার করা সহজ হইবে না। স্থানান্তরে, চিরজয়ী সুভাষ-চন্দ্রকে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল, আমি তাহাও বলিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস, তদতিরিক্ত পরাজয়ের সংস্পর্শ তাঁহার হয় নাই। তাঁহার আরাধ্য কর্ম্মে বাধা অথবা ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত বহু নহে; আমি মাত্র এই দুইটির সংবাদ জানি। বোধ হয় তদধিক

ভিটলভাই প্যাটেল আমাদের সর্দ্দার বল্লবভাইয়ের অগ্রজ। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতিরূপে তিনি যে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। বিখ্যাত 'ষ্টেট্সম্যান' পত্রের প্রখ্যাত সম্পাদক আর্থার মূরের সহিত ভিটলভাইয়ের রাষ্ট্র-আইন-সভার বিধি ব্যবস্থার বিসম্বাদ কেন্দ্রীয় আইনসভাদির ইতিহাসে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল স্থান লাভ করিয়াছে। ভিটলভাই প্যাটেল হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার মানসে ইউরোপ গমন করেন, সেইখানেই তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

সুভাষচন্দ্রও সেই সময়ে ইউরোপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভিটলভাই প্যাটেলের অন্তিম শয্যায় সুভাষচন্দ্র তাঁহাব সেবা করিয়াছিলেন। পুত্র যেমন পিতার সেবা করে, শিষ্য যে ভাবে গুরুর সেবা করে, অনুজ রুগ্ন অগ্রজের যেরূপ সেবা করে, সুভাষচন্দ্রও সেইরূপ সেবা করিয়াছিলেন। ভিটলভাই প্যাটেল মহাশয় জীবন সন্ধ্যা সন্নিকট বুঝিয়া একখানি উইল প্রস্তুত করেন। উইলের মর্ম্ম এইরূপ :—

ক—ভারতের বাহিরে, ভারতের কথা প্রচারিত হয় না। প্রচারের অভাবে ভারতের অবস্থা পৃথিবীর লোকের অবজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেছে। কংগ্রেসের মত ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর হিতকামী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ বিষয়ে অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

খ—আরও কতকগুলি কাজ আছে, যাহা ভারতবর্ষের বাহিরে আমরা করিতে পারিতেছি না।···

গ—এই সকল কার্য্যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আমি মনে করি যে, অর্থের অভাবে কাজ হয় না, সেদিন আর—আমাদের নাই। কাজে হাত দিলে, অর্থ আসিয়া যায়।

ঘ—আমার যা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা ভারতের হিত-

কল্পে,ঐ সকল কার্য্যে নিয়োজিত হয়, ইহাই আমার অন্তিম ইচ্ছা।

ঙ—কার্য্য প্রণালী কিরূপ হওয়া সঙ্গত, তাহা কতক লিখিয়া রাখিয়াছি; কতক সোদরোপম সুভাষচন্দ্র বসুকে বলিয়াছি। তিনি আমার প্রস্তাবিত কর্ম্মে সহায়তা করিবেন স্বীকৃত হইয়াছেন।

চ—আমার ধনসম্পত্তি ব্যয় সম্পর্কিত ব্যবস্থায় সুভাষচন্দ্র বসুর মতামত গণ্য হইবে।

ছ—সুভাষচন্দ্র বসুও············এই কয় জনের সহিত অছি নির্ব্বাচিত হইলেন।

আমার এমনও মনে হইতেছে, প্যাটেল মহাশয়ের চরমপত্র-খানিতে এমন একটি সর্ত্তও ছিল যে-সর্ত্ত-বলে সুভাষচন্দ্র একটি পরিমিত সংখ্যক অর্থ স্বর্গত ব্যক্তির ঈপ্সিত কার্য্যে ব্যয়িত করিতে পারিবেন। সুভাষচন্দ্র এই অংশ গ্রহণের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিফলপ্রযত্ন হইতে হইয়াছিল।

পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত বলিবার বাসনা আমার নাই; প্রবৃত্তিও হয় না। আস্তকুঁড়ে পরিত্যক্ত পুরাতন হাঁড়ীর মধ্যে কেবল যে কাসুন্দীই থাকে, তাহা ঘাঁটিতেই ইচ্ছা হয় না, তাই শুধু নয়, প্রান্তরে পরিত্যক্ত হাঁড়ীর ভিতরে গোখরো সাপও বাসা করে। আমি তাই, কাসুন্দী যত লোভনীয় ও রুচিকর সুখাদ্যই হোক্, হাঁড়ী স্পর্শও করিব না। তবে একটু—যতটুকু না বলিলে নয়, মাত্র সেটুকু বলিব।

স্বর্গত প্যাটেল মহাশয়ের অন্তিম পত্র (উইল) লইয়া বোম্বাই হাইকোর্টে মামলার সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা বলার প্রয়োজন আছে। সুভাষচন্দ্র এক পক্ষে; অপর পক্ষে স্বর্গত ভিটলভাইয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের পক্ষে শেষোক্ত দলে সংশ্লিষ্ট থাকাই স্বাভাবিক।

সুভাষবাবুর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু সুভাষের পক্ষে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট সুভাষচন্দ্রের বিপক্ষে মত দেন। এই লজ্জাকর ঘটনার পুনরুল্লেখ না করিলেও আমার আলেখ্যখানির অঙ্গহানি হইত না তাহা আমি জানি ; তবু যে এই কলঙ্ককালিমালিপ্ত কাহিনীকে, এত কাল পরে, ছাপার অক্ষরে গাঁথিয়া রাখিলাম তাহার কারণ এই যে, সে সময়ে এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল।

তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে। সে সময়ে এই মামলাটি বাঙ্গলাদেশের বড় লোকের ছেলেদের মামলার মত রূপ ধারণ করিয়াছিল বটে কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মামলার অবসানে বৈরীভাব পুঞ্জীভূত হইতে পায় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। বাঙ্গালীর ধনীর দুলালদের মামলার ঝামেলা এত সহজে নিবৃত্তি হয় না। হাইকোর্ট—ফুলবেঞ্চ—প্রিভিকাউন্সিল—মামলা চলিতে থাকে। মামলার যখন অন্ত হয়, তখন মামলাকারিরা প্রায়শঃ সর্ব্বস্বান্ত। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র হরলালকে—কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুর্বিনীত পুত্র—দেশ ছাড়া ও গোবিন্দলালকে রোহিণীকে আসক্ত করিয়া মামলার গতিবেগ সংযত করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাই শচীকান্ত আবার বারুণী পুষ্করিণী ও বারুণীর তট সজ্জিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, নতুবা মাতুল গোবিন্দলালের মত ভাগিনেয়বরকেও লোটা কম্বল সম্বল করিতে হইত।

ভিটলভাইয়ের উইল সংক্রান্ত মামলাটি ১৯৩৮ সালে অথবা তৎপূর্ব্বে হইলে, আদৌ মামলা হইত কি-না অনেকেরই সে বিষয়ে সন্দেহ তখনও ছিল ; এখনও আছে। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন গান্ধীজীর আশীর্ব্বাদে। ১৯৩৯ সালে পুনরায় তিনি রাষ্ট্রপতির আসন অধিকার করেন, গান্ধীজীর বিনা আশীর্ব্বাদে এবং প্রত্যক্ষ অমতে। ইহার ফলে

ত্রিপুরীতে 'দক্ষযজ্ঞ'অথবা 'অভিমন্যু বধ' নাটকাভিনয়; ১৯২৯এর প্রথমার্দ্ধ ভাঙ্গা পিরীত জোড়া দিবার চেষ্টাতে কাটিয়া গেলেও শেষার্দ্ধে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রেত-শিলায় ও বটমূলে পিরীতের পিণ্ডদান ও বিশ্বামিত্র অভিযান সুরু হইয়া যায়। উচ্চমণ্ডল সুভাষচন্দ্রকে অবজ্ঞা করিতে কৃতসঙ্কল্প এবং সুভাষচন্দ্র, উচ্চমণ্ডলের মুণ্ডপাত করিতে বদ্ধপরিকর। এই 'মহাসমরের' মাঝে উইলের মর্ম্মের সূক্ষ্মবিচার সম্ভব না হওয়ারই কথা। মানুষ মানুষ। প্রবৃত্তিনিচয়ও মানুষিক। সেগুলি প্রায়শঃ অমানুষিক হয় না।

মহাজাতি সদনের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে বিফলতা বরণ করিতে হইয়াছিল; এই উইলের সর্ত্তের উদ্ধার প্রচেষ্টাতেও তাঁহাকে ব্যর্থতার করে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। সাতচল্লিশ বর্ষ ব্যাপ্ত গৌরবোজ্জ্বল জীবনে পরাজয়ের এই দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত লিখিত থাকুক, এই বাসনাতেই ঘটনা দু'টি লিখিয়া রাখিলাম। ভবিষ্যৎ—দূর, অতিদূর—সুদূর ভবিষ্যকাল বিচার করিতে পারিবে তাঁহার 'জয়ের' তুলনায় পরাজয়, সমুদ্রের সহিত তুলনায় গোস্পদসম কিনা।

সাংসারিক নিয়মে, দুইটি বিফলতার ইতিবৃত্তও এই সময়ে এইখানেই বলিয়া রাখিবার বাসনা। দুইটিই তাঁহার দুই মহাগুরু সম্পর্কিত ঘটনা। সুভাষের পিতৃদেব রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসুর (পরে তিনি রায় বাহাদুরী বর্জ্জন করিয়াছিলেন) বিয়োগকালে তিনি তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত পুত্রের মুখ দেখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিতে পারেন নাই। সুভাষচন্দ্র তখন ইউরোপে; স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন নিষিদ্ধ। সুভাষচন্দ্রের দেশবাসী সর্ব্বশক্তিমান সরকারের নিকট আবেদন নিবেদনের হিমালয় রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন কিন্তু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে সরকারের সদিচ্ছার আভাস মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়

নাই। ভারতবর্ষের ভিতরে থাকিলে, 'ব্যানের' মর্য্যাদা কিরূপে রাখিতে হয়, গান্ধীজী ভারতবর্ষের নরনারীকে তাহা উত্তমরূপেই শিখাইয়াছেন। এই সকল বিষয়ে সুভাষচন্দ্র যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য। কিন্তু ইউরোপ হইতে আসিতে হইলে, সে কলা-কৌশল প্রযোজ্য হইবার নয়। তাই আবার সরকারের বন্ধ দ্বারের সম্মুখে ধর্ণা দিতে হইল। এবার দয়ার আধার গভর্ণমেণ্টের দয়া হইল কিন্তু এতই বিলম্বে শিবের মাথার বেলপাতা পড়িল যে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে পৌঁছিবার বহুপূর্ব্বে বৃদ্ধ জনক জানকীনাথের অতৃপ্ত, পিপাসার্ত্ত আত্মা দেহ-পিঞ্জরমুক্ত হইয়া অনন্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যবান—পুত্রভাগ্যে ভাগ্যবান পিতা আত্মীয় পরিজন সকলকেই অন্তিম শয্যার পার্শ্বে পাইয়াছিলেন ; পান নাই কেবল তাহাকে, তাঁহার সেই পুত্রটিকে যে পুত্র উত্তরকালে ভারতবর্ষের জন্য নূতন ইতিহাস, নূতন কাহিনী, নূতন গাথা রচনা করিয়া পরাধীন ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম পৃথিবীর স্বাধীন দেশের তুল্য সম্মান দান করিয়াছে। শুনি, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে ভাগ্যবান জানকীনাথ তাঁহার মহাভাগ্যবান পুত্রের কীর্ত্তি অবলোকন করিয়া আত্মপ্রসাদামৃতস্রোতে অবগাহন করিতেছেন। আজিকার ধরণীতে তাঁহার তুল্য সৌভাগ্যবান জনকের পরিচয় ত নরকুলে অপরিজ্ঞাত বলিয়াই মনে হয়।

পরম ভাগ্যবান সুভাষচন্দ্রের দুর্ভাগ্য যে পিতার পরলোকগমনকালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া পুত্রের পালনীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। আবার আরও দুর্ভাগ্য রত্নগর্ভা মাতৃদেবীও স্বর্গগমনকালে জগজ্জয়ী পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া যাইতে পারিলেন না। একদিকে বুকভরা স্নেহ, অনন্ত আশা আর একদিকে জনমের শোধ হতাশা লইয়া তাঁহাকে নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিতে

হইয়াছিল। পিতা মাতা কাহারও চিরজীবি নহেন; মানুষ অজয় অমর নহে; 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে' সব সত্য; সব জানি; সব বুঝি, সব মানি! তবু আশা, তবু কামনা, যেদিন ধরণীর এই উজ্জ্বল আলোক চক্ষুতে ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া অবশেষে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, এই সপ্তস্বরার সঙ্গীতভরা ধরণীর সমস্ত ঝঙ্কার যেদিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, সেইদিন যেন সেই ধূসর মলিন আলোকেও প্রিয়জন আননগুলি দেখিতে পাই; যেন প্রিয়জন পরিচিত কণ্ঠের কাকলী শুনিতে পাই; যেন শয্যায় তাহাদের স্পর্শ অনুভব করিতে পাই। মরিতে হইবে, মরণে করি না ভয় কিন্তু যাহাদের এ জনমের মত চিরতরে ছাড়িয়া যাইতেছি, ফেলিয়া যাইতেছি, শেষ দেখা দেখিতে, শেষ কথা শুনিতে শেষ সাধ না হয় কাহার? অন্তে তারকব্রহ্ম সনাতন বলিয়া যাইতে চাহি—কিন্তু যাহাদের ভালবাসি, বুকে করিয়া যাহাদের লালন পালন করিয়াছি, দীর্ঘ জীবনের পথে দুঃখের সাথী, সুখের সহচর যাহারা ছিল, তাহাদের মুখের পানে চাহিতে চাহিতেই যাইতে চাহি। জগদীশ্বরের তরণী আর তাহাদের স্নেহপ্রীতি! পথের সম্বল কোথায় আর কি পাইব? পাথেয় আর ত কিছুই নাই।

সুভাষের অন্তর্দ্ধানের কিছুদিন পরে কলিকাতার কোনও একটি চিত্রমন্দিরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলা সম্পর্কিত একখানি চিত্র প্রদর্শিত হইতেছিল; ছবিখানির নাম আমার মনে নাই, চৈতন্য লীলা অথবা নিমাই সন্ন্যাস কিম্বা ঐ ধরণের কোন একটি নাম হইতে পারে। এক যুগ অথবা তদধিক কাল কোন নাটকাভিনয় অথবা বায়োস্কোপ আমি দেখি নাই; সংস্রবও রাখিতে পারি নাই, তাই বহু চেষ্টা সত্বেও নামটি মনে করিতে পারিলাম না। আর তাহাতে কি বা আসে যায়! ছবির কাহিনীটি যে নদীয়ার চন্দ্র নিমাই

চাঁদের জীবনী লইয়া গ্রথিত তাহাও আগেই বলিয়াছি। সুভাষচন্দ্রের জননী এই ছবিখানি দেখিতে গিয়াছিলেন। কেন গিয়াছিলেন, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলিতে পারে।

গভীর রাত্রি। ধরিত্রী সুপ্তির ঘোরে হতচেতন; জীবজগৎ নিদ্রামগ্ন। নবদ্বীপও নিদ্রিত। শচীমাতা নিদ্রিতা; অপর কক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও নিদ্রিতা। কেবল নিমাই জাগ্রত। নিমায়ের চোখে নিদ্রা নাই। অকস্মাৎ নিমাই শয্যাত্যাগ করিলেন। শয্যাশায়িতা নারীর পানে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। শয্যায় কে যেন মল্লিকাফুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়াছে। কমনীয়, কুসুম কোমল আননে লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে; মুদ্রিত আঁখিপল্লব ভেদ করিয়া শঙ্কাহীন, সঙ্কোচশূন্য, সন্দেহলেশহীন গাঢ় পরিতৃপ্তি যেন ক্ষরিয়া পড়িতেছে; বক্ষের সুন্দর স্পন্দনে প্রেমপ্রীতি প্রণয় হিল্লোলিত হইতেছে; অধরোষ্ঠ দুখানি নারীর হৃদয়ের অক্ষয় অফুরন্ত অমৃতের স্বাদসন্তুষ্ট প্রজাপতির চিত্রিত পাখা দুখানির মত ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে!

নিমাই গৃহত্যাগ করিলেন। পা দু'টি কাঁপিল কি? নয়নপ্রান্তে একবিন্দু বারি আসিয়া স্থির হইল কি? বক্ষের স্পন্দন দ্রুত বহিল, না স্তব্ধ হইল? গৃহ যেমন নিদ্রামগ্ন ছিল, তেমনই নিদ্রামগ্ন রহিল; পুরবাসিগণ নিদ্রাঘোরে অচেতন রহিল। আকাশে তারা জাগিয়াছিল, তাহারা দেখিল; বাতাসের চোখে ঘুম নাই, সে দেখিল! কিন্তু কেহ কথা কহিল না। নিমাই নিঃশব্দে গৃহ ত্যাগ করিলেন। শচীমাতার ঘুম ভাঙ্গিল না; ষোড়শী সুন্দরী বিষ্ণুপ্রিয়া সুখনিদ্রায় মগ্ন রহিল; সর্ব্বনাশের দুঃস্বপ্নও তাহার ঘুমঘোর ভাঙ্গিতে পারিল না। "কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।"

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে গৃহে ক্রন্দন রোল উঠিল।

শচীমাতা নিমাই নিমাই রবে স্থলজলগগনপবন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।

প্রেক্ষাগৃহে যে আর একজন নিমাই-হারা শচীমাতা উপস্থিত ছিলেন কেহ তাহা জানিত না। একান্তে বসিয়া তিনিও যে আর এক জননীর সন্তানের নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রতিটি পদবিক্ষেপ লক্ষ্য করিতেছিলেন, কেহ তাহা কল্পনা করিতেও পারে নাই। নদীয়ায় নিশীথাকাশে ঊষার উদয়ে আলোক প্রকাশে পুত্রমুখদর্শনবঞ্চিতা মাতার হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, হাহাকার করিয়া উঠিল, তখনই এক ব্যথিত হৃদয়ের করুণ গীতি আর এক ব্যথিত হৃদয়ের বীণার তারে আঘাত করিল। এক সুরে বাঁধা, এক করুণায় ভরা বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের গান যেন ঐক্যতানে বাজিয়া উঠিল।

সুভাষচন্দ্রের জননী, বোধহয় নিজের অজ্ঞাতসারেই বলিয়া উঠিলেন, আমার নিমাই-ই বা কোথায়? বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধহয় একটু শব্দ হইয়াছিল; বোধহয় পার্শ্বে যাহারা ছিল, তাহারা কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল; বোধহয় আকৃতিগত সাদৃশ্যটা তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিল কিম্বা এমনই কিছু একটা হইয়া থাকিবে, হঠাৎ বিশাল প্রেক্ষাগৃহ প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি উত্থিত হইল—জয় সুভাষচন্দ্রের জয়!

অগণিত মানুষ যেন একটি কণ্ঠে জয়ধ্বনি তুলিল, সুভাষচন্দ্রের জয়!

পুরাণে কথিত আছে, হরিনামে মরা বাঁচিয়া উঠে; রামনামে পাষাণ প্রাণ পায়। হারানিধির নামে মাতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। সুভাষজননী দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া, চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। পরিজন যাঁহারা সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা অবসন্নদেহ সুভাষজননীকে লইয়া, গৃহে ফিরিলেন।

সুভাষ-জননী যে রত্নগর্ভা, তাহাতে আর সন্দেহ কি! পার্থিব

জগতে, জননী মাত্রেই যাহা কামনা করেন, সুভাষ-জননী সে সকলেরই অধিকারিণী ছিলেন। বহু পুত্রের জননী হইয়াও পুত্রভাগ্যে এমন ভাগ্যবতী দুর্লভ বলিলেও চলে। পুত্রগণ সকলেই কৃতী ও যশস্বী। আর সুভাষচন্দ্র? চন্দ্রগুপ্ত, প্রতাপ সিংহ, ছত্রপতি শিবাজী, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মতই মৃত্যুঞ্জয়ী, অবিনশ্বর, লোকবিশ্রুতকীর্ত্তি। ইতিহাসে জিজাবাঈর সঙ্গে, পুরাণে শঙ্কর মাতার সহিত, অর্জ্জুন-মাতা কুন্তী, মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুরার পার্শ্বে সুভাষ-জননীর স্থানও বিশ্ববিধাতার বিধান।

পঞ্চম স্তর—উদ্যোগ পর্ব্ব

বীজ ; বীজ হইতে অঙ্কুর ; অঙ্কুর হইতে চারা ; এবং চারা হইতে বৃক্ষ ! আবার বৃক্ষ হইতে মহামহীরুহ ! বিচিত্র সৃষ্টিকৌশল স্রষ্টার। তুলনাস্বরূপ বটের বীজটিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বটফল, আশা করি, পাঠিকারা দেখিয়াছেন। লাল লাল ছোট ছোট ফলগুলি—টুক্‌টুকু, তুল্‌তুল্‌ করিতেছে। পাখীর পক্ষে অতি সুখাদ্য। যাহারা পাখী ধরিয়া খাঁচায় পুরিয়া রাখে ও পোষে, তাহারা বটফল কুড়াইয়া আনিয়া পাখীকে খাইতে দেয়। সেই লাল টুক্‌টুকে ছোট ছোট ফলগুলির ভিতর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোস্তদানার মত বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। পোস্তদানার মত অতিক্ষুদ্র বীজ-কণা হইতে বটের মত বিরাট, বিশাল, বৃহৎকায় মহীরুহ জন্মায়, ইহা কি কম বিস্ময় ?

সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের অঙ্কুর বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া, আমিও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছি সেই ১৯২৮ সালে, কলিকাতার পার্ক সার্কাসে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন কালে যে বীজ বপন হইয়াছিল, তাহাই যে কালে দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া-খণ্ডে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট, বিশাল রূপ ধারণ করিবে, তাহাও কি কম বিস্ময় ?

আমি যে রাজনীতিক নহি, আমার বিচরণ-সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, আমার প্রবন্ধগুলির পাঠিকা এবং পাঠকগণের নিকট তাহা অকপটে ব্যক্ত করিয়াছি। আমি যে রাজনীতির দিক

দিয়া সুভাষচন্দ্রের কার্য্য কলাপের বিচার বিশ্লেষণ করিতে উদ্যত হই নাই, তাহাও গোপন রাখি নাই। একজন অত্যন্ত সাধারণ অথচ যৎসামান্য চিন্তাশীল ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সম্মুখে সুভাষচন্দ্রের জীবনের গতি যে ভাবে প্রবাহিত (প্রধাবিত বলিব কি?) হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে আমি সেইভাবেই আমার আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছি।

ভারতবর্ষের (শুধু ভারতবর্ষই বা কেন? ব্রহ্ম, মালয়, সিঙ্গাপুর কি অপরাধ করিয়াছে?) লক্ষ লক্ষ নর নারীর নিকট সুভাষচন্দ্র 'হিরো', বীর—অপরাজেয়, অপরাজিত, দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্ম্মদ বীর। বীর পূজা করিয়া আজ সকলেই ধন্য ও চরিতার্থ। আমি যখন সেই লক্ষ কোটী নরনারীর বহির্ভূত নহি, তখন তিনি আমারও বীর, পূজার্ঘ্য দিতে আমিও বাধ্য। কিন্তু আমার এই নিবেদন যে, কোন দলবিশেষ—রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন নৈতিক দলবিশেষের সহিত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্পর্কবিহীন বলিয়া একান্ত নিরপেক্ষভাবে সুভাষচন্দ্রের জয়ের ইতিবৃত্তও যেমন চিত্রিত করিয়াছি, তাঁহার পরাজয়ের কাহিনীও তদ্রূপ অঙ্কিত করিয়াছি। যে বিরাট বিশাল মহীরুহের বিশালত্ব দেখিয়া আজ অর্দ্ধ জগৎ অভিভূত, তাহার ক্রমবর্দ্ধমানকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে হইলে বিভিন্ন অবস্থার কথাও বলিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতে বাধ্য। আতপ তাপে বৃক্ষপত্র কি শুষ্ক হয় না? আবার নব বর্ষাগমে বৃক্ষ অঙ্গে যে সুচিক্কণতা ফিরিয়া আসে, তাহাও কি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? শীতে অবলুপ্ত পত্র বিটপীর শীর্ণ দীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া করুণার সঞ্চার হওয়া যেমন স্বাভাবিক, বসন্তের অভিষেক-মহাসমারোহ দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া কি তেমনই স্বাভাবিক নহে?

আমার নিবেদন এই যে, পক্ষপাতশূন্য তুলিকায় নিরপেক্ষ কালিতে

মুক্ত স্বাধীন চিত্তে যে চিত্র লিখিয়াছি, পাঠিকা ও পাঠক সেই চিত্র সেইভাবে গ্রহণ করিলেই লেখকের শ্রম যত্ন সার্থকতা লাভ করিবে।

মহাজাতি সদন নাটকের প্রথম অধ্যায়ে জমি প্রাপ্তি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছিল, বলিয়াছি; দ্বিতীয় অঙ্কে ভবন নির্ম্মাণ কল্পে কলিকাতা কর্পোরেশনের সাহায্য বাবদ এক লক্ষ টাকা বহু চেষ্টা সত্বেও পাওয়া যায় নাই; তৃতীয় অধ্যায়ে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সদনের ভিত্তি স্থাপন ও নামকরণ; চতুর্থ গর্ভাঙ্কে মহাজাতি সদনের কাজ—পূর্ণোদ্যমে না চলিলেও, চলিতেছিল; পঞ্চম ও শেষ দৃশ্যে সুভাষচন্দ্রের তিরোধান।

নাটকের শেষ দৃশ্যে যবনিকা পতন হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এখানে যে তাহা হয় নাই, তাহা আমাদের—ভারতবাসীর সৌভাগ্য।

এক সঙ্গে গোটা কতক মামলা সুরু হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকের মুখপত্রের সাপ্তাহিক পত্র "ফরওয়ার্ড ব্লকে"র কোন একটা প্রবন্ধে আপত্তিকর কথা লিখিত হওয়ায় মামলা; মহাজাতি সদনের মামলা; এবং কোন্ একটা বক্তৃতার ছল ধরিয়া মামলা; তা ছাড়া আরও দুই—একটা যেন, ঠিক মনে নাই। ১৯৪০ সালের শেষার্দ্ধে মামলাসত্র (অন্নসত্র, জলসত্র হইতে পারে; আর মামলাসত্র হইতে পারে না?) চলিতেছে, এমন সময়ে শুনা গেল, সুভাষচন্দ্র আর সে সুভাষচন্দ্র নাই; তিনি এখন ধর্ম্ম-কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিয়াছেন।

আমি সংবাদটি কি ভাবে শুনিয়াছিলাম, তাহা বলার প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। কলিকাতার সাহেব-পাড়ায় কোনও এক বাঙ্গালী-সাহেবের গৃহে নৈশভোজনকালে, কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন সদস্য সূপের গামলায় চামচ নাড়িতে নাড়িতে রঙ্গভরে গৃহস্বামীর উদ্দেশে কহিলেন—আর শুনেছেন মশাই, সুভাষবাবু ঘরে দোর বন্ধ ক'রে যোগ সাধন সুরু করে দিয়েছেন!

টেবিল বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি নারী এবং নর উপবিষ্ট ছিলেন। সকলেই কৌতূহলভরে বক্তার পানে চাহিলেন।

বক্তা ধীরে সুস্থে, বেশ চাখিয়া চাখিয়া, গরম সুপ খাওয়ার ভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন,—আজ সকালে 'অমুক অমুক' কর্পোরেশনের 'সেই ব্যাপারটা' নিয়ে দেখা করতে গেছলো; দেখা হয় নি। সুভাষবাবুর ভাইপোরা বিদেয় ক'রে দিয়েছেন; বলেছেন, তিনি পূজো করছেন, দেখা হবে না।

সেই টেবিলে একজন খ্যাতনামা রসিক ও স্পষ্ট বক্তা যুবক ছিলেন। কাহারও নাম যখন বলিলাম না, তিনিও বেনামী থাকুন।

তিনি ব্যঙ্গ স্বরে আবৃত্তি করিলেন—

"কাঁটা খেয়েছি মুড়ো খেয়েছি;
ধর্ম্মে দিছি মন।
তাই বাছা সকল নিয়ে যাচ্ছে
শ্রীবৃন্দাবন।"

প্রায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। হাসির ধমকে কয়েক মিনিটের জন্য কাঁটাচামচের মৃদু শব্দও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। হাসিবার কথা বটে! সুভাষচন্দ্রকে রাজনৈতিক নেতার রূপে দেখিতেই সকলে অভ্যস্ত! ইংরাজকে, ব্রিটিশকে নোটিশ-আলটিমেটাম সুভাষবাবু যত বার, যত রকমে দিয়াছেন, এমন আর কে দিয়াছে? গান্ধীজী অবশ্য বৃটিশকে ঘৃণা করেন না, হিংসা করেন না, ইহা বৃটিশ বহুবার শুনিলেও গান্ধীজীর মত শত্রু যে বৃটিশের আর নাই, বৃটিশ তাহা ভালই জানে। কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী জানে, বেশী ভয় করে সুভাষের রাজনীতিকে! বৃটিশ ইহাও জানে যে গান্ধীজীকে তোয়াজ করা চলিতে পারে; ভাল কথায় ভুলানোও সম্ভব। কিন্তু বৃটিশ সুভাষের দুটি চক্ষুর বিষ! পক্ষান্তরে, সুভাষও বৃটিশের চক্ষুশূল।

সুভাষ যখন বিলাতে, ছাত্রজীবন যাপন করিতেছেন, তখনকার

একটি কথা এখানে বেশ খাপ খাইতে পারে। বিলাতে ঝি—মেম; চাকর সাহেব; মুচীও শ্বেত; কুলীও সাদা। সুভাষ একখানি চিঠিতে লিখিলেন,—ইংরাজ যে আমার জুতা বুরুষ—সাফ্ করিতেছে, ইহাতে আমি গর্ব্ব বোধ করিতেছি। ইহার উপর টীকা টিপ্পনী অনাবশ্যক।

এই ত সে—সেদিন! লালদীঘির অন্ধকূপস্তম্ভটা সুভাষ ফুৎকারে উড়াইয়া দিল! লর্ড কার্জ্জন অগ্রপশ্চাৎ ভালমন্দ কত চিন্তা করিয়াই না সুকল্পিত মিথ্যা কাহিনীটিকে মর্ম্মরে মণ্ডিত করিয়া মহানগরীর বুকে "বডি-ব্রোচ" স্বরূপ সাঁটিয়া দিয়াছিলেন! বৃটিশ কি শুধু অস্ত্রবলেই ভারত জয় করিয়াছে? অস্ত্রের ধারের চেয়ে তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধিই ভারতবর্ষ জয় সুসম্পাদিত করিয়াছে। সেই বুদ্ধির—কূট বুদ্ধির ফল, অন্ধকূপহত্যার কাহিনী; আর তাহারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ, অন্ধকূপহত্যা-মর্ম্মর-স্মৃতি-স্তম্ভ। দেড়শত বৎসর কাল ঐ কাহিনী ভারতবাসীকে অহরহ স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, ভারতবাসীর বর্ব্বরতা, অমানুষিক পৈশাচিকতা! ইংরাজের লেখা ইতিহাসে আবাল্য বারম্বার পাঠ করিয়াও দুর্ব্বল-মেধা ভারতবাসী পাছে সে নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড ভুলিয়া যায়, লালদীঘির কোণে তাই ব্রিটিশ ঐ মর্ম্মরস্তম্ভ খাড়া করিয়া দিয়াছিল! কিন্তু কোথায় গেল দেড়শত বৎসরের দম্ভোদ্ধত মর্ম্মর-কাহিনী! নিঃশ্বাসের ভর সহিল না।

সুভাষ! এই সুমিষ্ট মধুবর্ষী নামের অন্তরালে একজন দৃপ্ত, প্রদীপ্ত ও প্রচণ্ড রাজনৈতিক নেতা, নির্ভীক ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধার কথাই লোকের মনে জাগে! জাগিতে অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; লোকেও অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই লোক রুদ্রাক্ষ ধরিয়াছে, গৈরিক পরিয়াছে, 'খট্টাঙ্গ পুরাণে' পদদ্বয়ের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, হয়ত তৈলাভাবে, চিরুণীর অভাবে ইন্দ্রলুপ্তির উপরেও জটাজুট ধরিতে সুরু

[illegible]—হাসিবারই কথা! অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে, গান্ধীজীকেও তিনি দারুণ 'ফাইট' দিয়াছেন এবং 'ফাইটে' নির্ঘাৎ জয়লাভ করিয়াছেন। এই সেদিন কলিকাতা কর্পোরেশনে অল্ডারম্যান ইলেকসানে হিন্দুবিদ্বেষী মুস্লিম লীগের সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। কত নিন্দা, কত গালি গালাজ উঠিয়াছে; কাণও দেন নাই। যদি বা কাণ দিয়া থাকেন, 'সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' করিয়াছেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের এ-আই-সি-সি'র সভায় কংগ্রেসের উচ্চ মণ্ডলের সমক্ষে প্রচণ্ড গৌরবে বাঙ্গালী-সংহতির পূর্ণাভিব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন! সেই লোক রাজনীতি ত্যাগ করিয়া, 'ফাইট' ছাড়িয়া, ধর্ম্ম—যোগ সাধনে রত হইয়াছেন—এ কি বিশ্বাস করা যায়?

আর, সংবাদ যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর বরাত নিতান্তই পোড়া। শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ আধ্যাত্মিক জগতে ধাপে ধাপে উর্দ্ধগতির সংবাদ যতই জয় জয় রবে বিঘোষিত করুন না কেন, সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে পণ্ডিচারী যে অবলুপ্ত জগৎ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অরবিন্দ ঘোষের বন্দে মাতরম যুগের লোক এখন বুড়া হাবড়া হইয়া পড়িয়াছে, হা-হুতাশ করিবার সামর্থ্য তাহাদের না থাকিতেও পারে; কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে সে কথা যে চিন্তারও অতীত। সুভাষ যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! কংগ্রেসে, শ্রমিক সংগঠনে, ছাত্র-আন্দোলনে সে অগ্নির প্রচণ্ড তেজ ও প্রবল উত্তাপ এখনও ভারতবর্ষ উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সুভাষের সহিত কাহার তুলনা?

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়!"

যাদৃশী ভাবনা যস্য। সকলেই একে একে, কখনও বা একসঙ্গে মন্তব্য করিতে লাগিলেন। উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবার, অসঙ্গত ও অসংলগ্ন মন্তব্য অথবা গর্ব্বাব্যঞ্জক উক্তির স্থান নহে এ কথা বলাই

বাহুল্য। কংগ্রেস অথবা কংগ্রেসের আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোন সংযোগ নাই, বিদ্বেষও নাই, এরূপ তাঁহাদের মনের ভাব। অনেকের সঙ্গেই আবার সুভাষ বাবুর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আছে। যাঁহাদের সহিত সে ভাব নাই, তাঁহাদেরও মনে বিরুদ্ধতার লেশমাত্র নাই। কিন্তু সংবাদটা এমনই অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য যে সকলেই তারস্বরে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ভোজ-টেবিলে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে রাম, রহিম, হাঁ, না একটি শব্দও করি নাই।

করি নাই তাহারও কারণ ছিল, কিন্তু আমার বন্ধুবর্গ ত সে খবর জানেন না; কাজেই তাঁহারা অনুপস্থিত সুভাষকে ছাড়িয়া উপস্থিত এই ক্ষুদ্র শফরীটিকে লইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। একজন কহিলেন—ডালহাউসী থেকে ফিরে লোকটা সুভাষের চেলা বনে গিয়েছে! কোন্ দিন না ক্ষিতীশ চাটুর্য্যের মত পতাকা ঘাড়ে ক'রে জেলে ঢুকে পড়ে। সে ঘটনাটি এই ঃ

সুভাষচন্দ্র তখন মেয়র। কর্পোরেশনের আফিসে, মেয়রের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। শিক্ষা-সচিব হঠাৎ ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় আসিয়া কহিলেন,—পাঁচটা বাজে; মিটিঙের সময় হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্র সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। নিচে নামিলেন। ফটকের বাহিরে বহু লোক জড়ো হইয়াছে। তাহাদেরই একজনের হাত হইতে একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হস্তে চৌরঙ্গীর দিকে চলিলেন; ক্ষিতীশও চলিলেন। চৌরঙ্গীতে পড়িতেই পুলিশ তাড়া করিল। ইহারা যাইবে, তাহারা যাইতে দিবে না। অগত্যা লাঠি বাহির হইল। ক্ষিতীশ মোটা সোটা লোক, দু'এক ঘা পড়িতেই ছিন্নকাণ্ড কদলী-তরুবৎ পপাত ধরণীতলে। সুভাষের লক্ষ্যও নাই, বীরদর্পে অগ্রসর হইতেছেন। পুলিশ বোধ হয় জানিত না লোকটি কে। অথবা জানিত, বলা যায় না, চার্জ্জ করিল। কে—যেন পুলিশকে লক্ষ্য

করিয়া বলিল, জান উনি কে? উনি কলিকাতার মেয়র! কিন্তু পুলিশ মেয়রের কি তোয়াক্কা রাখে?

যদি শুনিত দারোগা, পুলিশ লাঠি নামাইত; যদি শুনিত, ইনিসপেক্টর, লাঠি থামাইত। কয়েকজন লাঠি বাগাইয়া ধরিল; আর কয়েকজন মেয়রকে পাঁজা কোলা করিয়া তুলিয়া অর্থাৎ গিরেফতার করিয়া একটা ট্যাক্সিতে তুলিল। সুভাষ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বন্দে মাতরম্!

পুলিশ বসাইয়া দিতে চাহে, সুভাষ লাফাইয়া উঠিতেছেন, আর বলিতেছেন, বন্দে মাতরম্! বন্দেমাতরম্! সঙ্গের জনতা চীৎকার করিতেছে, বন্দে মাতরম্। কলিকাতা সহর, চৌরঙ্গী হেন স্থান, এক মিনিটে লোকারণ্য। সুভাষ হাঁকেন—বন্দে মাতরম্! জনতা প্রতিধ্বনি করে বন্দেমাতরম্!

সে যাত্রা অনেকেই সুভাষচন্দ্রের সহিত জেল-তীর্থে গিয়াছিলেন। পাছে জেলে যাইতে হয়, সম্মানজনক ব্যবধান হইতে আমি নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছিলাম।

সেদিন কথাটা আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই কিন্তু মন আমার প্রসন্ন ছিল না। কৈশোরে—সুভাষের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়াছি। প্রাপ্ত বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দ স্বামীজীর প্রতি যে অনন্যসাধারণ আকর্ষণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে সুভাষচন্দ্রকে গৈরিক-শোভিত দেহে বেলুড় মঠাভ্যন্তরে অকস্মাৎ অধিষ্ঠিত হইতে দেখিলেও বিস্মিত হইতে হইবে না। বহুকাল পূর্ব্বে, মান্দালয় প্রত্যাগত সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসক বিজ্ঞবর বিধানচন্দ্র রায় যখন নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার জন্য শিলঙে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, আমিও সেই সময়ে শিলঙে ছিলাম। শিলঙে তখন একটি ক্ষুদ্র রামকৃষ্ণাশ্রম ছিল, হয়ত এখনও আছে। আশ্রম ও আশ্রমবাসিদের সেবা কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা সুভাষের মুখে নিত্যই শুনিতাম।

পৃথিবীর উপরে সূর্য্যালোকের মত, সুভাষের উপরে স্বামীজীর প্রভাব যে সমান কার্য্যকরী হইয়াছিল, এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রের "আদালত" স্তম্ভে প্রকাশিত এক সংবাদে জানিতে পারা গেল যে, সন্ন্যাসাশ্রমের কথাটায় সত্যের সমূহ অপলাপ আছে; সুভাষচন্দ্র পীড়িত; প্রবল জ্বরাক্রান্ত। ত্রিপুরীর আগে হইতেই তাঁহার শরীর ভাল যাইতেছিল না, জানিতাম। আগেই বলিয়াছি যে গোটা কতক মামলা রুজু হইয়াছিল। যেদিন যে আদালতে যে মামলাটাই উঠে, আসামীর অসুস্থতা নিবন্ধন তাহাই মুলতুবী রাখিতে হয়। আমার মনে আছে, একজন নামজাদা ডাক্তারের লিখিত সার্টিফিকেটও যেন একদিন আদালতে পেশ করা হইয়াছিল। সুতরাং অসুস্থতায় সন্দেহ করিবার কারণ থাকিতে পারে না। আর শরীরং খলু ব্যাধি মন্দিরম্। কে না তাহা জানে?

কিন্তু এই Illness যে সত্য সত্যই strange illness, একদিন তাহা জানা গেল বৈ কি! ত্রিপুরী কংগ্রেসে যাত্রাকালে সুভাষচন্দ্র অসুস্থ ছিলেন; ত্রিপুরীতেও তাঁহার দেহ সুস্থ ছিল না। আমিও ত্রিপুরী-নাট্যাভিনয়ের দর্শক ছিলাম, দু' একদিন রাষ্ট্রপতির অসুস্থতা-জ্ঞাপক সমাচারপত্র (bulletin) দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে কিন্তু যে কারণেই হৌক, অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্য রাষ্ট্রপতির অসুখের কথাটা বিশ্বাস করেন নাই, আমার স্পষ্ট মনে আছে। নেতৃস্থানীয় দু' এক ব্যক্তি প্রকাশ্যেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধরের কোণে মৃদু হাসি, অধরোষ্ঠের নীচে চাপা হাসি, চোখে চোখে হাসি, প্রকাশ্যে—দিল্-খোস্ হাসি ত্রিপুরীর আসর সর গরম রাখিয়াছিল এ কথা আমি সহজে ভুলিব না। ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্রপতির অসুখ strange অর্থাৎ কাকতালীয় এবং

সন্দেহজনক কি-না তাহা জানিয়া লইবার সুযোগ আমাদের ছিল; আমি চেষ্টা করিলে, তাঁহার বাসস্থানে প্রবেশ লাভেরও অসুবিধা হইত না, কিন্তু নানা কারণে গোটা ত্রিপুরীর উপর আমি হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলাম। গান্ধীদলের পাণ্ডারা আমাদের (বাঙ্গালীকে) কাগজে কলমে প্রস্তাবের প্যাঁচে ফেলিয়া মারিতে চাহিয়াছিল, আমরা (বাঙ্গালীরা) বলং বলং বাহু বলম্—অভাবে ছত্র বলং সার করিয়াছিলাম অর্থাৎ ছাতা পেটা করিয়া জননী বঙ্গভূমির মান রাখিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। যাহা হৌক, সুভাষচন্দ্রের কাণেও এখবর পৌছিয়াছিল। পৌছিয়াছিল নিশ্চয়ই; নহিলে "Strange illness" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন হইত না। প্রবন্ধটি "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে, কলিকাতায় আর একবার হাসা-হাসির ধূম পড়িয়া গেল। স্নেহপ্রবণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অসুখের Strangeness অবগত থাকিয়াও, উচ্চমণ্ডল-পরিত্যক্ত সুভাষচন্দ্রকে সান্ত্বনা দান মানসেই নাকি প্রবন্ধটি তাঁহার সুখ্যাত মাসিক পত্রে স্থান দিয়াছিলেন—এ কথাও প্রকাশ্যে আলোচিত হইতে শুনা গিয়াছিল।

২১শে জানুয়ারী ১৯৪১ সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে সুভাষচন্দ্র অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। অন্তর্দ্ধানটি যখন রাজনৈতিক কারিগরির পর্য্যায়ভুক্ত, তখন এ কথা বলিলে একটুও অন্যায় হইবে না যে ২১শে জানুয়ারির অনেক পূর্ব্বেই তিনি অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধান ও এই সংবাদ প্রকাশের মধ্যে বেশ একটা সম্মানজনক ব্যবধান নিশ্চয়ই রাখা হইয়াছিল, যাহাতে পুলিশের দলও ফেউ ফেউ রবে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে না পারে।

ভারতসীমান্তের বাহিরে, আফগানিস্থানের সীমানার পরে, একটা নো-ম্যান্‌স ল্যাণ্ডের কথা, আমার মনে হয়, আমি সুভাষ বাবুর মুখে যেন কখনও শুনিয়াছিলাম। নো-ম্যান্‌স-ল্যাণ্ডটা বেওয়ারিশ

ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডের অধিকারী বলিতে কেহ নাই। কাবুলের আমীর এই ভূমিখণ্ডের উপর অধিকার বিস্তার করেন নাই; রাশিয়ার ভল্লুকও ইহার গায়ে নখদন্তের 'দাগ' বসায় নাই; ইংরাজও কি জানি কেন, তাহার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা সত্বেও, এখানে অনুপ্রবেশ করে নাই। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম। পরদেশে, সুভাষচন্দ্রের জনৈক অনুচর—ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর পদস্থ কর্ম্মচারী,—লেখককে বলিয়াছিলেন, এই বে-ওয়ারিশ ভূমিখণ্ডের প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। বৃটিশের সাম্রাজ্যের সীমারেখা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, ধরা পড়িবার যে শঙ্কা ছিল, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পার হইয়া সে শঙ্কা (শঙ্কা অথবা সন্দেহ, কোন্‌টা বলি? শঙ্কা শব্দের সঙ্গে ভীতির সম্পর্ক অতি নিকট বলিয়াই মনে হইতেছে; অথচ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ঐ শব্দটা আদৌ প্রযোজ্য হইতে পারে না। যে পথে সারাজীবন সুভাষচন্দ্র চলিয়াছেন, ভয় রাক্ষসী সে তল্লাট মাড়াইত না) দূর হইয়াছিল বটে কিন্তু পথের বিঘ্ন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

সুভাষচন্দ্রের অনুচরকে আমি সোজাসুজি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এই রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনীর অসমসাহসিক নায়কের বেশভূষার কোনরূপ নির্দ্দেশ তিনি দিতে পারেন কি-না? ভদ্রলোকটি (তিনি অ-বাঙ্গালী) সদুঃখে বলিয়াছিলেন,—নেতাজীকে এ প্রশ্ন আমরা কেহই করি নাই; করিবার দরকারও বুঝি নাই। তবে লোকে বলে, নেতাজী কখনও গৈরিক বসন, কখনও তিব্বতীয় লামার বেশ, কখনও বা পশ্চিমদেশীয় মুসলমানের পোষাক ধারণ করিয়া দুর্গম পথ চলিয়াছিলেন। কাবুলে প্রহরীর হস্তে আর সীমান্তে লুঠেরার কবলে পড়িতে হইয়াছিল সত্য কিন্তু বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

নো-ম্যান্‌স ল্যাণ্ড পার হইয়া রাশিয়ার সীমান্তে পৌঁছিয়াই সুভাষচন্দ্র আত্ম পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার শোনা

কথা। 'শোনা কথা' হইলেও কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হইতেছে। কিন্তু সে কথা আমরা পরে বলিব। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে যে আবহাওয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করি।

কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড তাঁহাকে ত্যাজ্য করিয়াছে; কংগ্রেসের দ্বার দীর্ঘ কালের জন্য তাঁহার সম্মুখে অর্গলবদ্ধ করা হইয়াছে; তাঁহার মানস-সন্তান ফরওয়ার্ড ব্লক মল্লযুদ্ধে কংগ্রেসকে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, মহাজাতি-সদন পেঁচো প্রাপ্ত হইয়াছে, তদুপরি মামলার ঝামেলায় ঝালা-পালা অর্থাৎ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াই তিনি গা-ঢাকা দিয়াছেন, একথা দেশের লোক এ[illegible]ের তরেও ভাবে নাই একথা আমি অন্তরযামীর অন্তরের দায়িত্ব লইয়াই বলিতে পারি। যাহারা রাজনীতির মতি-গতি বুঝিত, তাহারা একান্ত মনে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিল যে জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্যই সাম্রাজ্যদ্বেষী বিপ্লবী-বীর ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন। বাস্তব অথবা অবাস্তব, সম্ভব কিম্বা অসম্ভব এ সকল তর্ক বিচারের অবসর বা প্রবৃত্তি তখন 'আমাদের' ছিল না। 'আমাদের' বাসনা যেন পথের সহচরী হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। বোধ হয় ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Wishful thinking বলে; ইংরাজীতে আর এক প্রকারের অভিব্যক্তি আছে, Wish is the father of thought—হয় ত ইহাও তাহাই!

কারণও যে না ছিল এমন নহে। পার্ক সার্কাস কংগ্রেসের কথা, জলপাইগুড়ির প্রাদেশিক রাষ্ট্র-অধিবেশনের কথা, পরবর্ত্তী কালে ত্রিপুরীর কথা,—রামগড়ের কথা না-হয় থাক্—সম্প্রতিকার তুলনায় সবই পুরাতন হইয়া গিয়াছে। অন্তর্দ্ধান করিবার কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত এমন একটি বক্তৃতা ছিল না, এমন একটি বিবৃতি বাহির

হয় নাই, যাহাতে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত না হইয়াছে। সেগুলির ভাষা আমি বলিতে পারিব না কিন্তু মর্ম্মার্থ আমার দেশবাসীর সঙ্গে আমিও ভুলিতে পারি নাই। বোধ হয় কেহই ভুলে নাই। সে মর্ম্মার্থ এই ঃ

> বৃটিশ এমন বে-কায়দায় আর কখনও পড়ে নাই। এই সময়ে তাহার ঘাড় ধরিয়া আমাদের ন্যায্য পাওনা গণ্ডা আদায় করিয়া লওয়াই আমাদের উচিত! বৃটিশের সহিত সৌহার্দ্দ্যের সম্পর্ক আমাদের নয়; তাহাদের উচ্ছেদ করিতেই আমরা চাহি। যেন তেন প্রকারেণ বৃটিশের ধ্বংস হোক ইহাই আমাদের কাম্য। এই কাজে যে কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। বৃটিশের শত্রুর সহিত আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। তাহা—বৃটিশ বিনাশ!

আমি বারম্বার বলিয়াছি, আমি, "টেক্সট্ বুক কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত" স্কুল পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই যে, সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের ছবি আমাকে দিতেই হইবে, ভারতবর্ষে ইংরাজের সুশাসনের জয়গান করিতেই হইবে, নতুবা ছেলে মেয়েদের মাথা খাওয়ার কাজটা আমার দ্বারাই সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে! আমি স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই আমার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমার স্মরণশক্তি সেই প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের "One morn a sly fox met a hen" এবং তৎপর-ছত্রে (তাই বটে'?) "he had no one to help him"-এর যুগ হইতেই আমার প্রতি বিরূপ তাহা আমি স্বীকার করি; আবার সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করি, স্মৃতিশক্তি পাঠ্য পুস্তকে শাঠ্য করিলেও, অপরের পাওনা-গণ্ডার বেলা হিসাবে হামেসাই ভুল করিলেও, নিজের পাওনা কড়ি—বিশ আনায় এক টাকা হারে—বুঝিয়া লইতে ভুল করিয়াছে, কৈ এমন ঘটনা ত মনে পড়ে না। সেইজন্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার কাহিনী বাস্তবের গা

ঘেঁসিয়াই যাইবে—বিপথ ধরিবে না ; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পাশাপাশি—ট্রেণ ও মোটরের পাল্লা স্মর্তব্য।

সুতরাং সুভাষচন্দ্রের দেশের লোক কায়মনে ধারণা করিয়া লইল এবং অনেকে দিন গণিতেও লাগিল যে,

'জিনিয়া সমরে আসিছে অমর
বীরকুল তাহারই।'

ভারতবর্ষে, বৃটিশের আচরণ, অদ্ভুত হইতে অদ্ভুততর হইয়া উঠিতে লাগিল। সুভাষের অনুচর সহচরগণের উপর কঠোরতাও ক্রমান্বয়ে কঠিন ও কঠোর হইয়া উঠিতেছিল। দেশের মল্লিনাথকুল অস্থার্থ করিতে লাগিল, সুভাষ রণমদে মাতিয়া বিজয়ীর বেশে হিমালয়ের সিংহদ্বার পথে ভারতে প্রবেশ করিয়া অনুগত সহচরদের সহায়তা যাহাতে না পাইতে পারে, তাহারই জন্য এই সতর্কতা ; তাহারই জন্য তাহাদিগকে দলে দলে কারান্তরালে অপসারিত করা হইতেছে।

সুভাষচন্দ্রের সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যেও জয়চাঁদ, উমিচাঁদ, মীরজাফরের অভাব ছিল না। তাহাদের মুখোস ধীরে ধীরে খসিয়া পড়িতে লাগিল। সুভাষের ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য-তালিকায় নাম লিখাইয়া, কয়েকদিন পূর্ব্বেও যাহারা ভারত-উদ্ধারের সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত (all rights reserved) করিয়া লইয়া বৃদ্ধ কংগ্রেসকে গালাগালির গোলাগুলিতে প্রায় কুপোকাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে একে একে দু'য়ে দু'য়ে ফরোয়ার্ড ব্লক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ভাবটা এই যে—ফরোয়ার্ড ব্লক ? সে আবার কি ? সে আবার কোথায় ?

বঙ্গীয় আইন পরিষদে একজন মোড়ল জাতীয় সদস্য যখন পরম গাম্ভীর্য্য সহকারে ঘোষণা করিলেন যে, ফরোয়ার্ড ব্লকের সহিত কস্মিন্‌কালেও তাঁহার জান-পহচান্ ছিল না, সেদিন এই পরম

মান্যবর ও মহাশয় ব্যক্তির সততা ও সত্যপরায়ণতার নমুনা দেখিয়া অনেকে "নব-বর্ণপরিচয়" পঠন ও পাঠনে মনঃসংযোগ করিবে কি-না তাহাই ভাবিতে বসিয়া গিয়াছিল। সে কালের বর্ণপরিচয়ে লিখিত ছিল, "সদা সত্য কথা বলিবে"। একালের বর্ণপরিচয়ে লিখিত হয়, "কদাচ সত্য কথা বলিবে না—যদি সুবিধা হইবে বুঝিতে পার।"

সত্য সত্যই ভদ্রলোকটির সুবিধা হইয়াছিল। ফরওয়ার্ড ব্লককে জাহান্নমে পাঠাইয়া তিনি নাকি উজিরী পাইয়াছিলেন।

কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তি যে কদাচারই করিয়া থাক্, সুভাষের ফরোয়ার্ড ব্লকের আনুগত্য করা যুব-বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও মর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিল।

বলা বাহুল্য, সুভাষের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি শতধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; দেশের একটা বিশাল ও উৎসাহদৃপ্ত অংশ উৎকর্ণ হইয়া রণদামামার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে বৃদ্ধ কংগ্রেস যেন অনেকখানি ব্যাক্ গ্রাউণ্ডে—পিছাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। লোকের মনে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণাও (অবশ্য খুব সূক্ষ্ম সূত্রাকারে) জন্মিতেছিল যে অক্লান্ত কর্ম্মী গান্ধীজীরও সমরক্লান্তি আসিয়া গিয়াছে। আজীবন যিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছেন, তাঁহার ক্লান্তি আসিয়াছে, এই চিন্তাও, আর একটি অংশের চিত্তে অবসাদ আনয়ন করিতেছিল। গান্ধীজীর 'পরে তাহাদের অপরিসীম আস্থা।

ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থলে যখন যুগপৎ উৎসাহ ও অবসাদের মেঘ ও রৌদ্রের লীলা চলিতেছিল, সেই সময়ে সুভাষচন্দ্রের কোন সংবাদই নাই; ঝড়ের আগেকার পৃথিবী, আকাশ বাতাস স্থল জল, জড় ও জীব সমস্তই থম্-থম্ করিতেছে। আজ আমরা অনুমান করিতে পারি, দীর্ঘ পথ অতিবাহনে একটি দেশের পর আর একটি দেশ, একটি রাজ্যের পর আর একটি রাজ্য অতিক্রমণে, কখনও ট্রেণে, কখনও

গো-যানে, কভু উষ্ট্র পৃষ্ঠে কখন বা পদব্রজে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে, সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে, সংবাদ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

অকস্মাৎ একদিন বৃটিশের প্রচার বিভাগের ঢাক-ঢোল-কাড়া-নাকাড়া-সানাই-বাঁশী-কাঁসি ঝম্-ঝম্ রম্-রম্ করিয়া উঠিল। সেটা বোধহয় ক্রিপস্ মহোদয় ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত মোলাকাৎ সুরু করিবার সময় হইতে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত হইয়া পড়িল।

অক্ষশক্তি (জাপান ও জার্ম্মানী মুখ্যতঃ। ইতালীর কথা বড় জানা যায় নাই) বেতারে করজোড়ে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, খবর্দ্দার, ক্রিপসের ধাপ্পায়, দোহাই ভারতবাসি, ভুলিও না। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিও না।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যে সময়ে কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দিল্লীতে জোর আলোচনা—আপোষ আলোচনা চালাইতেছেন, তখন দেশের মধ্যে, জনসাধারণের মধ্যে আপোষের বাসনাটা ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এক এক সময়ে ইহাও মনে হইয়াছিল যে বৃটিশের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি মিটিয়া গেল; আর সত্যাগ্রহ করিতে হইবে না; আইন অমান্য করার দরকার হইবে না; আর জেল-ঘর করিতে হইবে না—দেশে শান্তির আবহাওয়া বহিল। আঃ, বাঁচা গেল!

দেশে যখন এই হাওয়া বহিতেছে, অক্ষশক্তি ঠিক তখনই ঘনঘন সনির্ব্বন্ধ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিতেছে। লোকের পক্ষে বিভ্রান্ত হইয়া পড়াই স্বাভাবিক। সুভাষের নিষ্ঠাবান ভক্তবৃন্দ আশঙ্কা করিতে লাগিল, রণক্লান্ত গান্ধীজী যে-কোন মূল্যে দেশের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে উদ্যত। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মনোভাব ক্রমশঃই কঠোর হইয়া উঠিতেছিল।

সুদূর আফ্রিকায়, প্রথম যৌবনে, বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টাররূপে মিষ্টার এম, কে, গান্ধী যেদিন হইতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই নিন্দাস্তুতিতে তাঁহার সমজ্ঞান। দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের মর্য্যাদার অমর্য্যাদা ঘটিয়াছে বোধে আততায়ীর ছুরিকাঘাতও পৃষ্ঠে বহন করিতে হইয়াছিল। গান্ধীজীর জীবনে এইরূপ বৈচিত্র্যের অভাবের অপেক্ষা বাহুল্যই অধিক। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ আনীত প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আশা ভরসা চিরকালের জন্য—অন্ততঃ সুদীর্ঘকালের জন্য—অন্তর্হিত হইবে, অক্ষশক্তির বেতার এই বার্ত্তাই প্রচার করিতেছিল। গান্ধীজীর মনোভাব কিরূপ ছিল ?

গান্ধীজী-কথিত দুইটি ছত্রে তাঁহার—তথা কংগ্রেসের মনের কথা সুব্যক্ত হইয়াছে। গান্ধীজী ক্রিপস্-অফারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে কহিয়াছিলেন—A post-dated cheque on a crashing Bank. টলটলায়মান ব্যাঙ্কের উপরে অনির্দ্দিষ্ট তারিখের চেক্ লইয়া ভারত কি করিবে ?

অন্যের পক্ষে ক্রিপস্ প্রস্তাবের গূঢ় মর্ম্ম বিশ্লেষণ করিতে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিতে হইত—তাহাতেও সম্যক সমালোচনা হইত কি-না বলা দায়। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবনে একটিমাত্র সাধনাই করিয়াছেন, ভারতবর্ষ যাঁহার ধ্যান জ্ঞান ধারণা, ভারতের স্বাধীনতা যাঁহার জাগ্রতের সাধনা, স্বপ্নের কামনা, সত্যের ভিত্তিতে যাঁহার জীবনাদর্শ গঠিত, সত্যের আলোকে যাঁহার দৃষ্টি সুদূর-দর্শনক্ষম, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সহজে প্রতারিত হয় না।

ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। শুধু কংগ্রেস নহে, লীগও স্পর্শ করিতে চাহে নাই।

জার্ম্মাণী-জাপান যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অনন্ত আশাবাদী আশা করিতেছিল, সুভাষচন্দ্র অক্ষ-পক্ষে যোগদান না করিলে, ক্রিপস্-অফার সম্পর্কে অক্ষশক্তির এরূপ দারুণ শিরঃপীড়া ঘটিত না।

সুভাষচন্দ্রের অনুচর, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সদস্যগণ মনে করেন, ভারতবাসীর অনুমান মিথ্যা না হইতেও পারে, সুভাষচন্দ্র এই সময়েই, রাশিয়া কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বার্লিনে হিটলার সকাশে উপনীত হইয়াছিলেন।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে—ঠিক কতটা পূর্ব্বে তাহা মনে নাই, দুঃসংবাদ আসিল, বিমান সংঘর্ষে বেঘোরে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে।

মর্ম্মন্তুদ সংবাদের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইয়াছিল, মল্লিখিত বাঙ্গলা ভাষার গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। বিষাদের মধ্যেও হর্ষের কথা এই যে বাঙ্গলা দেশ তাহার ক্ষতির পরিমাণ করিতে না করিতে, হায় হায় ধ্বনি, হাহাকার উঠিতে না উঠিতে সংবাদের প্রতিবাদ আসিয়া গেল। দেশ একটা মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সুভাষের মৃত্যু সংবাদে দেশের লোকের অশ্রুসজল চক্ষু সুভাষ-চন্দ্রের মাতার উদ্দেশে ছুটিল। গান্ধীজীই বোধ করি সর্ব্বাগ্রে সুভাষ-জননীর নিকট সান্ত্বনার বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মৃত্যু সংবাদে ভারতবর্ষ যেন নিস্পন্দ, স্তব্ধ—হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সংবাদ প্রত্যাহৃত হইলে লোকে একবাক্যে কহিতে লাগিল, সুভাষ বোস এত সহজে মরিবার পাত্র নহেন।

কথাটা অসার, যুক্তিহীন সন্দেহ নাই, তাহা ধ্রুব জানিয়াও সমগ্র ভারতবর্ষ দৃঢ়কণ্ঠে তাহার অন্তরের ভাষা ব্যক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করিল না।
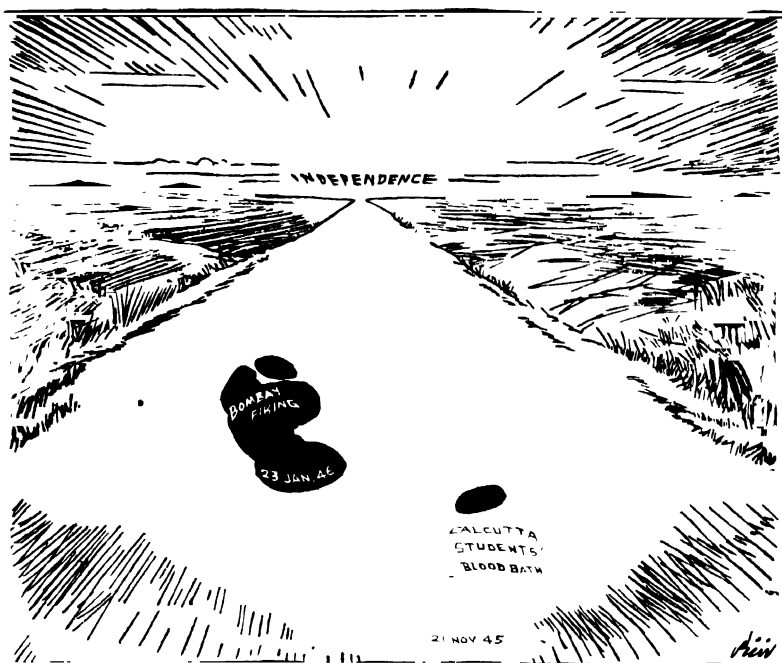
কদম কদম বাড়ায়ে যা-

(অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

আরও একটা কথা বলিতে লাগিল। বলিল, মৃত্যু গুজবে পরমায়ু বাড়ে। ভারতবর্ষ একান্ত-মনে কামনা করিল, তাহাই হৌক।

কামনা আজও অভিন্ন ; অপরিবর্ত্তিত। সুভাষচন্দ্র চিরজীবী।

বন্দে মাতরম্।

জয় হিন্দ্।

ষষ্ঠ স্তর—রথচক্র

বঙ্কিমচন্দ্র ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে চিরকালের জন্য ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হৌক। গুলিখোর নবাব আর রাজ্যলোলুপ বণিক বাঙ্গলাদেশের যে দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিল, তাঁহার অমর লেখনী অনন্ত কালের জন্য তাহা অবিনশ্বর করিয়া রাখিয়াছে। ১৩৫০এর মন্বন্তরের চিত্র অঙ্কিত করিবে কে? বঙ্কিম নাই, বঙ্কিমের সে অনলবর্ষী ভাষা নাই, বজ্রগর্ভ লেখনী নাই; পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের নিখুঁত চিত্র লিখিতে পারিবে এমন লেখক ত দেখি না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ—ত্রিশ চাল্লিশ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া—দুর্ভিক্ষে মরিল, তবু বিদ্রোহ করিল না?

পণ্ডিতজী তখন আমেদনগর দুর্গাভ্যন্তরে বন্দী; বাঙ্গলার সে দুর্দ্দিনের দুর্দ্দশার চিত্র চাক্ষুষ করিবার দুর্ভাগ্য তাঁহার হয় নাই। যাহাদের সে দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগ হইয়াছিল, তাহাদেরই একজনের মুখে শুনুন, পণ্ডিতজী! বিদ্রোহ ত অনেক বড় কথা, বিদ্রোহ করিতে শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন হয় সুতরাং বিদ্রোহের কথা থাক্। এই কলিকাতা সহরের খাবারের দোকানে থরে থরে সজ্জিত খাদ্য—মিষ্টান্নের কাচের আলমারীর সামনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মরিয়া গিয়াছে, একটা দুইটা নয়, এমন শত শত বুভুক্ষু—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুধার মরণ-যন্ত্রণা সহিতে সহিতে মৃত্যুর কোলে তলাইয়া পড়িয়াছে, তবু হাত বাড়াইয়া একটি মিষ্টান্ন তুলিয়া লইতে চেষ্টা করে নাই; কাড়িয়া খাইবার দুঃসাহস দেখায় নাই।

মরিতে হইবে, মরিয়াছে ; মরণের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ; মরিতে জানে, মরিতে আসিয়াছে—মরিয়াছে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেও মরিয়াছিল, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষেও মরিল। তবু কি প্রভেদ ! ছিয়াত্তরে লুটতরাজ করিয়া খাইবার ও খাওয়াইবার মানুষ ছিল ; নরমাংস ভোগ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার লোকও ছিল। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে তাহারও অভাব। গ্রাম, পল্লীগ্রাম, গণ্ডগ্রাম উজাড় করিয়া নর-কঙ্কালে শমনযাত্রা পরিচালিত করিয়া সহরে আসিয়া কয়েকদিন ফ্যান, কয়েকদিন ঘণ্ট, কয়েকদিন রাস্তার আবর্জ্জনা খাইল, তারপর দল বাঁধিয়া যমরাজের রাজ্যে বসবাস করিতে চলিয়া গেল।

আইন সভায় বক্তৃতার বন্যা বহিতে লাগিল ; সংবাদপত্রে বজ্র নিনাদিত হইতে লাগিল ; মন্ত্রীমহাশয়গণ স্তোভে স্তোভে চিড়ার মণ্ড বানাইতে লাগিলেন ; ব্যবসায়ীর ধূলিমুষ্টি স্বর্ণমুষ্টি হয় ; আর মানুষ মরে। গণিবার লোক নাই, দাহ করিবার কাঠ নাই, কবর দিবার স্থান পাওয়া যায় না ! রাজপথে মৃত দেহ পড়িয়া থাকে ; শৃগালে কুকুরে মানুষে আবর্জ্জনাকুণ্ডে মুখ পুরিয়া দিয়া কলহ করে।

এই সময়ে জনশ্রুতিতে শুনা গেল, সুভাষ বোস বৃটিশের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন, বাঙ্গলার বুভুক্ষ নরনারীর জন্য ব্রহ্মদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টন চাউল পাঠাইতে চাহে। একে একে দুয়ে দুয়ে দলে দলে লোক এই গুজব প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখনকার দিনে গুজবে আস্থা স্থাপন করা বড় সহজ ছিল না। পরাজিত ও পলায়িত বৃটিশের প্রচার-যন্ত্র ঢক্কানিনাদ করিয়া বলিতেছে—বর্ব্বর জাপানের বর্ব্বরতায় ব্রহ্মের লোক অনাহারে মরিতেছে—বস্ত্রাভাবে জীবন্তে মৃত, ইত্যাদি ইত্যাদি। বৃটিশের প্রচারকার্য্যের মহিমা তখন মানুষের মনে এমন বদ্ধমূল ধারণার গোড়া পত্তন করিয়া দিয়াছে যে, সুভাষ বোসের প্রস্তাব বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিতেও প্রবৃত্তি

হয় নাই। বৃটিশের প্রচারযন্ত্র আরও বলিয়াছে—ওটা গুজব মাত্র। আসলে নাকি ঐ ধরণের প্রস্তাব আদৌ আসে নাই।

সুভাষের ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর মুক্তিপ্রাপ্ত সদস্যগণ ভারতে আসিয়া ঐ খবরটাই সর্ব্বাগ্রে যাচাই করিতে চাহিয়াছিল। বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের সংবাদে নেতাজী এতই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের প্রধান শত্রু বৃটিশের দ্বারস্থ হইতেও তাঁহার বিবেকে বাধে নাই। নেতাজীর বাঙ্গলা দেশ, নেতাজীর স্বজাতি বাঙ্গালী না খাইয়া মরিবে, বাঙ্গালী সুভাষ বোস, বাঙ্গলার সুভাষ বোস কেবলমাত্র কাণে শুনিয়াই কর্ত্তব্যের একশেষ করিবে! তদধিক কিছুই নয়? সুভাষ বোসের সৃষ্টিকর্ত্তা তেমন ধাতুতে সুভাষকে সৃষ্টি করেন নাই। কাহার জন্য তাহার এই বিরাট অভিযান? কাহার হিতার্থে এত ক্লেশ, অবর্ণনীয় দুঃখ, কল্পনাতীত কষ্ট স্বীকার? কাহার কল্যাণ কামনায় অকল্পিতপূর্ব্ব, দুর্জ্জয়, দুর্ম্মদ রণ? স্বদেশের জন্য, স্বদেশবাসীর জন্যই নহে কি? তাঁহার সেই দেশ, সেই দেশবাসী না খাইয়া মরিতেছে, সোনার বাঙ্গলায় শ্মশানের ভয়াবহ স্তব্ধ নীরবতা বিরাজ করিতেছে, তাহা শুনিয়া, তাহা জানিয়াও সুভাষ বোস নিরস্ত থাকিবে? নিশ্চেষ্ট রহিবে? জার্ম্মেণী স্বীকার করিয়াছে, ইতালী মানিয়া লইয়াছে, জাপান আনুগত্য করিয়াছে, আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের আসন, অক্ষ-শক্তির অন্তর্ভুক্ত গভর্ণমেণ্ট সমূহের সহিত সমভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুভাষ বোস সেই গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বাধিনায়ক—পৃথিবী ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। আর সেই সর্ব্বাধিনায়কের স্বদেশে স্বজনগণ কীটপতঙ্গের মত, বনের পশুর মত অনাহারে শুকাইয়া কাঠ হইয়া মরিতে থাকিবে, ভারতবাসী-গঠিত 'স্বাধীন-ভারত' সরকার ভীষণ মন্বন্তরের সংবাদ শুনিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকিবে; প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করিবে না; ধিক শত ধিক! তবে কিসের জন্য আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট?

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর লোকই বলিয়াছে—"কলিকাতা সহরের পথে পথে লোক মরিয়া পড়িয়া থাকিত, সময়ে সৎকার হইত না, পথচারিকে শব ডিঙ্গাইয়া পথ চলিতে হইত, প্রত্যেকটি খবর আমরা পাইতাম। বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে চাষী উৎসন্ন যাইতেছে, তাঁতী তাঁত ফেলিয়া, জেলে জাল ফেলিয়া, নাইয়া নৌকা ফেলিয়া পেটের জ্বালায় দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ভিক্ষান্নের আশায় কাতারে কাতারে সহরের পথে অস্থি কঙ্কালের শোভাযাত্রা করিয়া চলিতেছে, আমাদের নিকট কোন খবরই অজ্ঞাত থাকিত না।"

"নেতাজী পুরুষসিংহ! কিন্তু বাঙ্গলার দুর্দ্দশার কথা শুনিতে সেই পুরুষসিংহেরও চোখ দিয়া জল ঝরিত। কত রাত্রিতে সুপ্তিহীন নেত্রে নেতাজী উষ্ণ মস্তিষ্কে প্রান্তরমধ্যে একাকী বিচরণ করিতেন। রক্ষীবাহিনীর অথবা তাঁহার দেহরক্ষী বাহিনীর কোন লোক সেই সময়ে তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিত না; গেলে নেতাজী বিরক্ত হইতেন। কিন্তু নেতৃস্থানীয় কোনও ব্যক্তিকে নিকটে পাইলে, বালকের মত কাঁদিয়া উঠিতেন; বলিতেন, আমার সোনার বাঙ্গলা শ্মশান হইতেচলিল!

"নেতাজী তাঁহার বাঙ্গলা দেশ ও বঙ্গ দেশবাসীকে কত ভালবাসিতেন, তাহার প্রমাণ আমরা নিত্য পাইতাম; বর্ব্বর জাপানও তাহার পরিচয় পাইয়াছে। অসভ্য জাপান, ব্রহ্মদেশ অধিকার করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের উপর বেপরোয়া বোমা বর্ষণ করিয়াছিল; বঙ্গদেশকেও বোমা বিধ্বস্ত করাই ছিল তাহার ষ্ট্রাটেজি। জাপানীর এই 'সমর-কৌশল' শুনিবামাত্র নেতাজী সিংহগর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন—খবর্দ্দার! বৃটিশ-বিজয়ী, মার্কিনজয়ী জাপান বাঙ্গালীর সতর্কবাণী উপেক্ষা করিতে পারে নাই।

"এই বাঙ্গালী সুভাষচন্দ্র বোস! লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে এক সূত্রে গাঁথিয়া, এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য, এক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিয়া

একটি মাত্র মানুষে রূপান্তরিত করিয়াছেন! ভারতবর্ষ, ভারতবাসী কোনদিন এমন ঐক্য দেখিতে পায় নাই। ভারতবর্ষের ভারতবাসী হয় ত ইহা বিশ্বাস করিতেও ইতস্ততঃ করিবে কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিরে, নেতাজীর মিলন-মন্ত্রে যে ঐক্য সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া বর্ব্বর জাপানকেও স্তম্ভিত হইয়া, সেই ঐক্যের সম্মুখে নতশিরে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী জাপানীকে, একতাবদ্ধ ভারতবাসীর নিকটে পরাভব মানিতে হইয়াছিল। ধন্য নেতাজী!

"চাউল প্রেরণের প্রস্তাব এইরূপ ছিল: হয় রেডক্রসের মারফতে, না-হয় কোনও যুদ্ধ-নিরপেক্ষ দেশের দ্বারা ভারতবর্ষে চাউল প্রেরণ করা হইবে। একটি মাত্র সর্ত্ত এই ছিল যে, বাঙ্গলা-দেশে বুভুক্ষু বঙ্গবাসীর মধ্যে সেই চাল বণ্টিত হইবে।

"বায়ুমুখে প্রস্তাব প্রেরণ করিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে নেতাজী অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। একদিন হতাশাভরে কহিলেন—ভারতবর্ষের উপকার সাধন বৃটিশের কোষ্ঠিতে লিখিত নাই! বৃথা চেষ্টা করিয়া মরিতেছি। বাঙ্গলাদেশ নির্ম্মনুষ্য হইলেই সাম্রাজ্যবাদী শান্তি পাইতে পারে। বাঙ্গলার উপর বৃটিশ চিরদিন বিরূপ।

"নেতাজীর অনুক্ষণের সহচরগণ বলিতেন, বাঙ্গলার মন্বন্তরের সংবাদ যতদিন পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, নেতাজীর আহারে রুচি ছিল না; নিদ্রায় শান্তি দেখি নাই; কর্ম্মবীরেরও কর্ম্মে ঔদাসীন্য দেখা গিয়াছিল! নেতাজী স্বীয় আত্মীয়-পরিজনের কথা ভ্রমেও উত্থাপন করিতেন না; কারণ তিনি ভালই জানিতেন, না খাইয়া তাহারা মরিবে না, ভগবানের ইচ্ছায় সামর্থ্য ও সঙ্গতি তাহাদের যথেষ্ট আছে। সাধারণ বাঙ্গালীর দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়াই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন; অশ্রুর বড় বড় ফোটা চোখ ফাটিয়া বাহির হইত।

"মনে হইত, নেতাজী তাঁহার আধখানি প্রাণ, আধখানি মন, আর বিশাল অন্তঃকরণের অনেকখানি তাঁহার বাঙ্গলাদেশে রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

"চাকুরী বা ব্যবসায় কর্ম্ম উপলক্ষ্যে যাহারা বিদেশে বাস করে, প্রবাসে, স্বদেশের স্মৃতি, স্বজনের মুখ ক্ষণে ক্ষণে যেমন আনমনা করিয়া তুলে, রণরঙ্গমত্তাবস্থাতেও, মনে হইত তাঁহার বঙ্গদেশ নেতাজীকে উচাটন করিয়া ফেলিত। আর, নেতাজীকে যখন ধ্যানমগ্নাবস্থায় দেখিতাম, কেন জানি না মনে হইত, নেতাজীর ধ্যান জ্ঞান ধারণা তপস্যা সমস্তই একমাত্র বঙ্গ জননীতেই নিবদ্ধ।

"এই বঙ্গভূমি—এই ভারতবর্ষ আমরা জন্মাবধি দেখিয়াছি; আমাদের জন্মভূমি, তাহাও চিরকাল জানি। কিন্তু নেতাজী পরদেশী, প্রবাসী নরনারীকে নূতন রূপে নূতন করিয়া সেই চিরপরিচিত বঙ্গভূমি—সেই ভারতবর্ষ দেখাইলেন। মনে হইল, এমন ত কখনও দেখি নাই; এমনটি ত কখনও শুনি নাই! তাই যেদিন ভারতীয় জাতীয় বাহিনী নদনদী গিরি প্রান্তর উপত্যকা অধিত্যকা লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্ম সীমান্ত পার হইয়া আসামে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন নেতাজী-চিত্রিত বঙ্গভূমিকে অভিনবরূপে দেখিবার, অভিনব বন্দনায় বন্দিত করিবার জন্য বাহিনী আনন্দে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। সেইদিন মনে হইয়াছিল—

> নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
> গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
> অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি
> ছায়া-সুনিবীড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।

—বলিয়া বঙ্গ জননীর চরণ বন্দনার যোগ্যতা এতদিন পরে আজই হইয়াছে।

"ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভারতবর্ষে বাস করিয়া ভারতবর্ষকে

সেদিন যে মহিমময়ী মূৰ্ত্তিতে দেখিলাম, ইহার পূর্ব্বে কেন তেমন করিয়া দেখি নাই, কেন তেমন করিয়া ভাবি নাই, কেন মাতার চরণ বন্দনা করি নাই—তাহাও কি বলিতে হইবে? আমরা আজন্ম—আশৈশব কাহার কাছে পাঠ লইয়াছি, কাহার চোখে আমাদের দেশকে দেখিয়াছি, তাহাও বলিবার দরকার আছে কি?"

* * *

১৯৩৯ সালে, কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি বিশেষ সভায় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিতর্ক হইতেছিল। শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন তখন মেয়র। A. R. P. সম্পর্কে কর্পোরেশনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কোন জাঁদরেল অফিসার কর্পোরেশনের উপর 'লর্ডিং' করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; সভায় তাহার আলোচনা হইতেছিল। দর্শক হিসাবে আমি (লেখক) সভায় উপস্থিত ছিলাম। ইউরোপীয় সদস্যগণ গভর্ণমেণ্টের জাঁদরেলের দোষ স্খালনের চেষ্টায় গলদঘর্ম্ম হইতেছেন; দেশীয় সদস্যগণ উত্তম 'দাওয়াই' নির্ব্বাচনে ব্যস্ত। সভা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এ রকমের সভা চিরদিনই জমে। কালা বনাম ধলার কলহ সর্ব্বদা শ্রুতিসুখকর।

সুভাষচন্দ্রও বক্তৃতা করিলেন। ছোট ছোট কথায় সাজানো গুটি কয়েকছত্রে বক্তব্য শেষ হইল। দু'একটি ছত্র আমি উদ্ধৃত করিব:

"But he (Subhas Chandra Bose) would like to know—what possibility of danger was there of an air raid on the City of Calcutta? He was not a technical expert. He was a layman. But even a layman could understand that there was no possibility of an air raid on the City of Calcutta. * * *

"Therefore the only purpose which could be served by a work of this kind (A. R. P.) was to create panic amongst the citizens of Calcutta and if he might say so, to create war atmosphere."

আবার ঃ

He (সুভাষচন্দ্র) averred that there was not the slightest possibility of danger of air raid on the city and as far as he could judge, the only purpose which a work of this kind could serve was to create panic in the minds of the citizens and also to create war atmosphere."

দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপী কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী অসত্য হইতে পারে নাই। কলিকাতায় কয়টি বোমা জাপানীরা ফেলিয়াছিল? কয়দিনই বা ফেলিয়াছিল। খুব বেশী হয় ত, তিন দিন। একবার, দিন দুই বোমা বর্ষণের পর (বর্ষণ বলিব না ইল্‌সা গুঁড়ি বলিব তাহাই ভাবিতেছি) জাপানীরা গা ঢাকা দিয়াছিল; বৎসর খানেক পরে আর একদিন আসিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন বিহার করিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু লোকালয়ের দিকেও ঘেঁসে নাই। সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলে, লোকে বলাবলি করিত, 'কলকাতার কিছু হবে না, ভয় নাই; সুভাষ-বাবুর মা কলকাতায় আছেন।' ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর লোকেরা বলে, কলিকাতা বা বঙ্গদেশে যে খাণ্ডবদাহ হয় নাই, তাহার মূলে তাহাদের নেতাজী।

সুভাষচন্দ্র বক্তৃতায় আতঙ্ক সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছিলেন। আতঙ্ক যেন ঝড়ের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল। যেমন প্রবল তাহার গতি, তেমনই প্রচণ্ড তাহার বেগ। সামনে যাহা পাইতেছে তাহাই উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছে। ঘরের চাল উড়িয়া যাইতেছে; বিরাট, বিশাল বটও ভূতলশায়ী হইতেছে; নদীতে নোঙ্গর বাঁধা নৌকা কাগজের ঘুড়ির মত অদৃশ্য হইতেছে।

ইহার সহিত যুদ্ধকালের ভারতবর্ষের অবস্থার তুলনা খুব সহজেই

হইতে পারে। যেখানে যত ধান, চাল, ডাল ছিল, সমস্তই 'গেরেপ্তার' হইয়াছে; 'সশস্ত্র পুলিশের পাহারায়' অদৃশ্য স্থানে চালান গিয়াছে। লোক কি খাইবে সে কথা ভাবিবার সময় তখন নয়! তখন জাপানী বোম্বেটের ভাবনাই বড় ভাবনা। বোম্বেটের হাতে স্বর্ণভাণ্ডার না পড়ে! যাহার রসদের জন্য দুশ্চিন্তা নাই, সে বড় যোদ্ধা। জাপানী বোম্বেটে ভারতবর্ষে ঢুকিয়া ভারতের অফুরন্ত আহার্য্য ভাণ্ডার যদি হস্তগত করিয়া ফেলিতে পারে, পৃথিবীতে হেন শক্তিধর কেহ নাই যে তাহার বিরুদ্ধতা করিতে পারিবে! এ কথা একশত বার—সহস্র বার সত্য। হাতের মারের চেয়ে ভাতের মার বড় মার! মিত্রশক্তি হাতে ত মারিবেনই, সে ত জানা কথাই; তবে তার আগে ভাতেও মারিতে হইবে। ভারতের স্বর্ণশস্য অপসারণ, রণনীতির একটা অঙ্গ, ইহা অস্বীকার করা মূর্খতা মাত্র। কিন্তু যেরূপ দ্রুতগতিতে; অগ্রপশ্চাৎ ভালমন্দ বিবেচনারহিতভাবে অপসারণ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা কতখানি রণশাস্ত্রসম্মত তাহা আমাদের মত সমরশাস্ত্রের ফার্ষ্ট বুক অফ রিডিং জ্ঞানহীন লোকের পক্ষে নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টাও বাতুলতা। সে চেষ্টা করিব না; তবে তাহার প্রত্যক্ষ ফল যাহা দেখা গেল, তাহাতে ইহাও বলিতে ইচ্ছা হয় যে, সমরশাস্ত্র মানুষে রচনা না করিয়া অরণ্যের হিংস্র জন্তু কর্তৃক রচিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আর, সত্যই যদি মানুষ সেই শাস্ত্রের রচয়িতা হয়, তাহা হইলে সে মানুষ মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত মানুষ বলিয়াই বোধ হয়।

নদীতে নৌকা রাখা বারণ। কি-জানি বোম্বেটেরা আসিয়া নৌকাগুলা যদি দখল করিয়া বসে! ভারতের প্রবেশদ্বার—সিংহদ্বার —বঙ্গদেশ (আসাম ভারতের দেউড়ী অথবা বহির্ফটক মাত্র!)—বঙ্গদেশ নদী-মাতৃক। নদনদীগুলি যেন বঙ্গমাতার গলে সাতনরী হার। কোনটা নেকলেস্, কোনটা নেক্ চেন্, কোনটা মব চেন্, কোনটা জড়োয়া হার, কোনটা বা মুক্তার মালা। নদীজলে সমগ্র বঙ্গ প্রদক্ষিণ

করা যায়। শুধু বঙ্গ ? গঙ্গাবক্ষে ডিঙ্গা ভাসাইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ কে ঠেকায় ? যেখানে যত নৌকা ছিল, ছোট, মাঝারি, বড়— আস্ত, ভাঙ্গা, ফুটা—নির্ব্বিচার, নির্ব্বিকার, ওয়ারেণ্ট বাহির হইল—গোষ্ঠীশুদ্ধ ইনটার্ণড—স্থানান্তরিত।

মোটর, লরী, বাস সব গেল। তা যাক্। কিন্তু হায় রে হায়! অভাগা সাইকেল! তাহাকেও যে ফাঁসীকাষ্ঠে লটকাইতে হইতে পারে এ কথা কে কবে ভাবিয়াছিল ? অতি ক্ষুদ্র, অত্যন্ত নীচ, একান্ত অবজ্ঞেয়; কোথাও মর্য্যাদা নাই, সম্মানের আসন কেহই দেয় না— কোনদিনই কেহ তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে নাই, জাপানী আতঙ্কে তাহার মাথারও মূল্য ধার্য্য হইল, তাহারও মান বাড়িল। তাহার বিরুদ্ধেও শমন জারী হইল, হোল্‌সেল হুলিয়া বাহির হইল। সাইকেলও 'পুলি-পোলাও' চালান গেল।

সমরশাস্ত্রবিশারদগণ একবারও চিন্তা করিলেন না যে চাল ত চালান চলিয়া গেল, লোকগুলা খাইবে কি ? বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থানে নৌকাই জীবিকা আহরণের একমাত্র যান—বাহন। নৌকার অভাবে লোকগুলা জীবিকা উপার্জ্জন করিবে কিরূপে সে কথা ভাবিবার ফুর্স্‌ৎ তখন রণপণ্ডিতগণের ছিল না। অথবা তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ফাঁসী ত হইয়া যাক, পরে আপীল শুনিলেও চলিবে। জাপ-বোম্বেটেদের বাধা দেওয়ার কাজ আগে, অন্য সব পিছে।

গভর্ণমেণ্টকেই আতঙ্ক যখন এইভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে আটিয়া সাঁটিয়া ধরিয়াছে, তখন ছার মনুষ্যগুলার অবস্থা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ভাল ভাল কেতাবে বেতসপত্রের কথাটা আপনারা নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। আমি সেই উদাহরণটি প্রয়োগ করিয়া নিরস্ত হইতে ইচ্ছা করি।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেই সভায় সুভাষচন্দ্র যে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, দুইটিই দৈববাণীর মত সত্য-রূপ ধারণ

করিয়াছিল। আতঙ্কের কথা আমি আগেই বলিয়াছি; যুদ্ধের অবহাওয়াও বেশ জমাট ও ঘোরালো করিয়া তোলা হইয়াছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। হিজ ম্যাজিষ্টিস্ গভর্ণমেন্ট—কি ইংলণ্ডে, কি ভারতবর্ষে—কি রণস্থলে, কি শাসন ব্যবস্থায় যে অপরূপ ও অভিনব কর্ম্মনৈপুণ্য ও কর্ম্মক্ষমতা, পূর্ব্বাহ্নে—সময় থাকিতে বুদ্ধি, কৌশল ও কূটনীতি প্রয়োগপূর্ব্বক 'যুদ্ধের আবহাওয়া', প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই 'সাত খুন মাফ' হইয়া গিয়াছিল, নতুবা হিজ ম্যাজেষ্টিস্ ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্ট বা কি, আর ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্টই বা 'ভদ্র সমাজ মুখ দেখাইতে' লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। যুদ্ধের আবহাওয়া চালু ছিল বলিয়াই, লজ্জা ঘৃণা ভয় রহিত ও বিবর্জ্জিত হইয়াও সমাজে চলাফেরা করিতে পারিতেছেন, অন্যথা তাঁহাদের আচরণে লজ্জাও লজ্জা পাইত; ঘৃণাও ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিত; ভয় ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পালাইত। কূটনীতি ভবিষ্যদ্রষ্টা, ভবিষ্যদ্বেত্তা হইয়া যুদ্ধেয় আবহাওয়া (war atmosphere) সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। সেকালের হাতুড়ে ডাক্তার যেমন এক ক্যাষ্টর অয়েল দ্বারা সর্ব্বরোগের নিরাময় ঘটাইত, যুদ্ধের আবহাওয়ার দোহাই পাড়িয়া বৃটিশও সমস্ত দোষ স্খালন করিয়াছে। কূটনীতিতে (di plomacy) বৃটিশ বিশ্বে অপরাজিত এবং অপরাজেয়, ইহা যে অস্বীকার করিবে, তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যয় অনস্বীকার্য্য। কিন্তু এই কূটনীতিও সুভাষচন্দ্রকে প্রতারিত করিতে পারে নাই।

মানুষ কে-যে কোথায় যাইবে, কিরূপে প্রাণ রক্ষা পাইবে, কোথায় গেলে নিরাপদ হইতে পারিবে, একমাত্র চিন্তাতেই দিশেহারা—উদভ্রান্ত। রক্ষক রক্ষা করিবেন সে ভরসা আদৌ নাই, এক তিল নাই। আত্ম-বুদ্ধি, আত্মকৌশলের উপরেও সম্পূর্ণ আস্থা নাই; আবার ভগবানের উপর ভার ছাড়িয়া দিয়াও যে নিশ্চিন্ত হইবে, স্বস্তি পাইবে,

সে মনের জোরও নাই। মুখে ভগবান ভগবান করে বটে কিন্তু কেবল টাইম টেবল মুখস্ত করিতেছে আর মানচিত্র খুলিয়া অঙ্ক কষিতেছে কোথায় লুকাইলে জাপানী-বোমার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে! বিমানে বিমান উড়িলে উদরের অন্ন ধান্য হইয়া যাইতেছে; রাত্রে ভুঁইপটকার আওয়াজ শুনিলে হৃদপিণ্ডে বরফ জমিতেছে।

প্রথমে তৈজসপত্র, (পিতল কাঁসা) পরে অলঙ্কারপত্র (সোনারূপা) হাল বলদ, তারপরে জমি জায়গা, বাগান পুকুর, ঘরবাড়ী, তারওপরে পুত্র কন্যা, অবশেষে স্ত্রী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিল বটে, তাহাও সম্ভব হয় নাই। ঐ সকল বেচা-কেনার প্রক্রিয়া যতদিন ধরিয়া চলিয়াছিল, ততদিনে মানুষ অর্দ্ধমৃত হইয়াছিল, বাকী অর্দ্ধটুকু অল্পকাল মধ্যে অল্প আয়াসেই খতম্ হইয়া গিয়াছিল। আতঙ্ক জীবনী-শক্তিটুকু অপহরণ করিয়া কাজটা সহজ ও হাল্কা করিয়াছিল সুতরাং শেষ হইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই।

১৯৪৩ সালের ঘটনা ১৯৪৬ সালেও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। আমাদের পাঠিকা ও পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য স্মরণ করিতেও পারিবেন। মৃত্যু যে কত সহজে কত অবহেলে,—যেন খেলাচ্ছলে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে গ্রাস করিতে পারে—সেই লক্ষ লক্ষ মানুষ মানুষীও নিঃশব্দে, নির্ব্বিবাদে, বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুর কোলে এলাইয়া পড়িতে পারে সেদিন ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। কাজেই আতঙ্ক যে অসাধ্য সাধন করিয়াছিল, তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকাল কি এই অবিশ্বাস্য ভয়াবহ কাহিনী বিশ্বাস করিতে পারিবে? মনে হয় অসম্ভব!

যে দেখে নাই, তাহার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।

আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে একদা বর্গীর ভয় হইয়াছিল। আজিকার দিনে কচি কাচাদের ঘুম পাড়াইবার 'সেকেলে' ব্যবস্থা বোধহয় নাই; আজকাল 'আয়া' ঝি, দাসীরা মা-জননীদের কাজ অনেক হাল্কা

করিয়া দিয়াছে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত মা ঠাকুরমারা কচিদের ঘুম পাড়াইবার সময়ে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেন—

খোকন ঘুমুলো
পাড়া জুড়ুলো ;
—বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দোব কিসে ?

ছড়াটির ভাবার্থ নিরাকরণ করিলে এটুকু বুঝা যায় যে একদিন বঙ্গদেশে বর্গীর উপদ্রব হইয়াছিল এবং খাদ্য শস্যের অভাবে রাজার বা জমিদারের খাজনা পরিশোধের চিন্তায় বাঙ্গলা দেশবাসীকে চিন্তান্বিত হইতে হইয়াছিল। তাহার বেশী—বেশী হইলে কত বেশী, আমরা কি কিছুই বুঝিতে পারি ?

কাল প্রবাহে ১৯৪২-৪৩ সালের ঘটনার গুরুত্বও লাঘব হইয়া যাইবে। যাহারা মরিয়াছে, তাহারা বলিতে আসিবে না ; যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা চিরস্থায়ী নহে ; আর ইতিহাস কদাচিৎ সত্য কথা লেখে। অধিকন্তু ইতিহাস ধনীর মোসাহেব, শক্তিমানের স্তাবক, বিলাসীর বয়স্য ; ইতিহাস গণিকাবৃত্ত।

বাজে কথা, ছোট কথা, তুচ্ছ কথা ইতিহাস লিখে না ; লিখিতে পারে না ; লেখা সম্ভবও নহে। তথাপি, ভারতবর্ষের যুদ্ধকালের ইতিহাস যখন স্খলিত হইবে, তখন বাঙ্গলাদেশে চার টাকা মণ চালের দাম চাল্লিশ টাকা হইয়াছিল, এই অতি তুচ্ছ কথাটি লিখিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া রাখিতেছি। ভারতবর্ষ, তথা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর পূর্ব্বাঞ্চলের গোলা-ঘর (শস্য ভাণ্ডার) বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর এই গোলাঘরে চালের মূল্য চার পাঁচ টাকা হইলে মানুষ মাথায় হাত দিয়া ভাবিত। অনাগত দুর্দ্দিনের পদধ্বনি শুনিয়া আতঙ্কিত হওয়া উচিত। আতঙ্কপ্রসূত অবস্থাও অবিমৃষ্যকারিতার

অব্যবহিত ফলে সেই শস্যকুবেরের ভাণ্ডার বঙ্গদেশ হইতে চাল অদৃশ্য হইয়া গেল। যেখানে একেবারে অদৃশ্য হইতে পারিল না, সেখানে চল্লিশ হইতে একশত টাকায় মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া পড়িল। শৃগালে ছাগল ভক্ষণ করিতেছে, ইহার সংবাদ-মূল্য নাই কিন্তু ছাগল শৃগাল চর্ব্বণ করিতেছে, ইহার সংবাদ-মূল্য (news value) অবশ্য স্বীকার্য্য! চার পাঁচ টাকার চাল পঞ্চাশ বা একশত টাকায় বঙ্গদেশে বিক্রীত হইতেছে, ইতিহাস কি এই সংবাদের মূল্য দিবে না?

ইউরোপ খণ্ডে সমরানল ধূ ধূ জ্বলিতেছে, সেখানে মানুষ মরিতে পারে, মরাই স্বাভাবিক; এসিয়ার একাংশেও রণদানব তাণ্ডব করিতেছে, সেখানে মানুষ মরিবে ইহাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোহিনূর সদৃশ ভারতবর্ষে— যেখানে রণবাদ্য বাজে নাই বলিলেই হয়, যে ভূখণ্ডে জাপানী পা দিয়াছিল কিম্বা দেয় নাই— ঠিক বলা যায় না, সেখানে, সেই ভারতবর্ষে বিনা যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ (কত লক্ষ—ত্রিশ, চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ, সঠিক সংখ্যা আজও নির্ণীত হয় নাই) নরনারী নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল! কেহ দু' ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিল না; কেহ দু'টা সান্ত্বনার বাণী শুনাইল না; কেহ হরিধ্বনিও করিল না, খোদা তালাহের নামও উচ্চারণ করিল না। এই নিদারুণ কঠোর ধ্রুব সত্য, অনাগতকালের পৃথিবী বিশ্বাস করিতে পারিবে কি?

অথচ এই ভারতবর্ষ গান্ধীজীর মত মহামানবের কর্ম্মক্ষেত্র; জওহরলালের মত মানবপ্রেমিকের কার্য্যক্ষেত্র; সুভাষচন্দ্রের মত বীর পুরুষের কর্ম্মস্থল। এই ভারতবর্ষ পৃথিবীর পুরাণে অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা বলিয়া খ্যাত। এই ভারতবর্ষের একাংশে—বঙ্গদেশে—ধনধান্যে পুষ্পে ভরা বাঙ্গলা দেশে এক মুষ্টি অন্নের অভাবে, লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসীর বিলোপ, ইতিহাসের পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন বটে!

গান্ধীজী তখন কোথায়? জওহরলালই বা কোথায়? একজন পুণায়; অপরজন আহ্‌মেদনগরে—পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন; মানুষের সহিত

সকল সংযোগ বিনষ্ট। সুভাষচন্দ্র বৃটিশের আয়ত্তের বাহিরে। সুভাষচন্দ্র বৃটিশের শত্রু। তাঁহার আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। শত্রুর দান সহজ অবস্থাতেই মানুষ গ্রহণ করে না ; যুদ্ধের ভিতরে ত কথাই নাই।

অধিকন্তু সুভাষ বোস তখন মিরজাফর, উমিচাদ, লর্ড হ হ, লেপোল্ড আমেরীর পুত্র জন-আমেরীর পর্য্যায়ভুক্ত, তাহাকে কুইসলিং ও পঞ্চম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া চিত্রিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা চলিতেছে। তাহার দান গ্রহণ করিয়া বৃটিশ জাতি চিরদিনের জন্য, অগ্রদানী ব্রাহ্মণের মত, সমাজে ঘৃণিত-পতিত জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি ?

এক অঙ্কে আতঙ্কের সৃষ্টি, আর এক অঙ্কে স্বকীয় কৌলীন্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৃটিশ তাহার বিজয় শকট পরিচালিত করিল। সেই জয়-রথচক্রতলে চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ বাঙ্গালী যদি মরিয়াই থাকে, তাহাতে কাহার কি আসে যায় ? ম্যালেরিয়ায় মরিতে পারিত—অভ্যাস আছে ; যক্ষ্মায় মরিত ; ভূমিকম্পে মরিত ; জলকম্পে মরিত ; না-হয় দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে। পার্থক্য কি এবং কতটুকু ?

প্রবাদ আছে, রথচক্রতলে মরিলে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। বৃটিশের জয় রথও ত রথ ! পঞ্চাশ লক্ষ পুনর্জ্জন্মের দায় এড়াইয়াছে ত !

সপ্তম স্তর—স্বপ্নবাণী

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের গঠনকালের সম্পূর্ণ চিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে করি এবং সেই জন্য বৃটিশ পরিত্যক্ত এবং জাপানী-অধিকৃত দেশগুলির তদ্‌কালীন অবস্থার আলোচনা অধিকতর বিশদরূপে করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইবার সময় এখনও আসে নাই; সে সময় আসিতে এখনও বিলম্ব আছে; বাধাও অনেক। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ যদি কোন দিন স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে, যদি কোনদিন ভারতবর্ষীয় ও ব্রহ্মদেশীয় নরনারী চিন্তায় স্বাধীনতা, কণ্ঠে স্বাধীনতা, লেখনীতে স্বাধীনতা আয়ত্ত করিতে পারে; যদি কোনদিন মা'কে মা বলিয়া প্রাণ ভরিয়া মন খুলিয়া মুক্তকণ্ঠে ডাকিতে পারে; জননী জন্মভূমির সেবায় অবাধে কায়মনপ্রাণ নিয়োজিত করিতে পারে—যেদিন অর্ডিনান্সের কৃপাণ, ডিফেন্স রুলের বর্শা ফলক, ডিটেনশনের অসি, ডিপোর্টেশনের খড়্গ উদ্যত হইয়া প্রতি পদে বাধা, প্রতি পদবিক্ষেপে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না, সেইদিন, কেবল সেইদিন সুভাষচন্দ্রের জাতীয় বাহিনীর সেবাব্রতসৃষ্ট আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বাঙ্গীন ইতিবৃত্ত রচিত হইতে পারিবে! সেইদিন—সেই শুভ মুহূর্ত্ত কত দূরে? কবে আসিবে সেই শুভদিন, কবে শুনিব সেই মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, ধন্য হইবে শ্রবণ, ধন্য হইবে জীবন, উৎকর্ণ ভারতবর্ষ, উদগ্রীব ভারতবাসী তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমাদের এই ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে অতীতে এমন একটা দিন আসিয়াছিল, যেদিন দেশে রাজা ছিল না, শাসন ছিল না, জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। দেশ অরাজক, শাসনের নামে লুণ্ঠন, হত্যা, বিশৃঙ্খলার অবাধ প্রবাহ। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; হিন্দু মৃতকল্প নির্জীব, ইংরাজ-বণিক বাণিজ্যের ছলে অনুপ্রবেশ করিতে সুরু করিয়াছে। বঙ্গ সাহিত্য সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজ বঙ্কিমচন্দ্র সেই দুর্দ্দিনের চিত্র তাঁহার অক্ষয় ও অব্যয় তুলিকায় চিরোজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

"তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে। ইংরাজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তা'তে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবীসিংহের ইজারা। পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে দাঁড়াইয়া এদমণ্ড বর্ক সেই দেবীসিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্ব্বতোদগীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক, দেবীসিংহের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার অনন্তকাল সমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজমুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্য-পরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। আজিও শত বৎসর পরে, সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্রভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল।"

জাপান অতর্কিত-আক্রমণ চালাইয়া প্রথমে মার্কিন, পরে বৃটিশের জমিদারীর এক একটি অংশ যেন এক একটি থাবায় গ্রাস করিয়া ফেলিল। যেটা ধরে, সেইটাই অধিকার করিয়া লয়। পৃথিবীতে ভূত আছে কিম্বা ভূত শব্দটাই ভুয়ো তাহা তর্কের স্থল হইতে পারে কিন্তু ভূতের ভয় যেমন অলীক নয় এবং ভূতের ভয়ে মানুষ, প্রাণ লইয়া পালাইতে পথ পায় না, জাপানের ভয়ে ইংরাজও তেমনই সর্ব্বস্ব ফেলিয়া কেবলমাত্র প্রাণ লইয়া পালাইতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়, ঠিক

এই অবস্থা। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের ইতিহাস যদি ইংরাজ লেখে তাহা হইলে সত্য গোপন করিয়া আজগুবি রূপকথাই রচনা করিবে; কারণ সত্য কথা লিখিতে হইলে তাহার কলঙ্কিত ক্লৈব্যই প্রাধান্য পাইবে। ষ্ট্রাটেজির গন্ধমাদন চাপাইয়াও কাপুরুষতা চাপা দেওয়া সম্ভব হইবে না; কাজেই তাহাকে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতেই হইবে। ইতিহাসে যত মিথ্যার স্থান হয়, এমন আর কোথাও নহে। মুসলমান বঙ্গ বিজয়ের ইতিহাস লিখিয়াছিল বলিয়াই সতেরো জন মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হওয়ার গল্প ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস ইংরাজ না লিখিয়া বাঙ্গালী লিখিলে, ইতিহাসের রূপ ফিরিয়া যাইত। মহারাজা নন্দকুমার জালিয়াৎ কিম্বা ক্লাইভ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, সে তর্কের বিচার ইংরাজ না করিলেই সত্য উদ্ঘাটিত হইতে পারিত।

তর্কের খাতিরে আমরা যদি ষ্ট্রাটেজি বলিয়াই ধরিয়া লই, তাহা হইলেও মোদ্দা কথা এই দাঁড়ায় যে, বৃটিশ তাহার জমিদারী, ধন সম্পত্তি, ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। বৃটিশের অনুগত ও অনুরক্ত ভারতীয় সৈন্য সামন্ত, অনুচর সহচরদেরও ফেলিয়া—তাহাদিগের স্ব স্ব ভাগ্যের করকমলে, অ-দৃশ্য অদৃষ্ট এবং অজ্ঞাতকুলশীল জাপানীর হাতে ফেলিয়া—পলায়ন করিতেও তাহাদের ন্যায়-ধর্ম্মে, মানবীয় ধর্ম্মে, সামরিক ধর্ম্মে বাধে নাই। সেই যে গ্রাম্য ভাষায় বলে, "চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা"—জাপানীর ভয়ে কণ্ঠাগত-প্রাণ বৃটিশ ইহাকেই চরম ও পরম নীতি বলিয়া গণ্য ও শিরোধার্য্য করিয়াছিল।

জাপানীরা প্রায় নির্ব্বিবাদে বৃটিশের রাজ্য-অংশ সমূহ অধিকার করিয়া ফেলিল বটে কিন্তু রাজ্য গঠন অথবা রাজ্য শাসন করিবার শক্তি সামর্থ্যও ছিল না, অবসরেরও অভাব ছিল। তাহার নিকট, আবার সেই গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে বলে "চোরের রাত্রিবাসই লাভ-

জনক” হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। টোকিওর সিংহাসনে, ধরায় অবতীর্ণ জগদীশ্বর মিকাডো অথবা তাঁহার মন্ত্রণা পরিষদের অভিলাষ যাহাই থাকুক, জাপানী সৈনিকদল পৈশাচিক উল্লাস ভরে লুঠতরাজ, খুন জখম, নারী ধর্ষণ করিয়া বিজয়োৎসব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। যে সকল দেশে প্রকৃত-প্রস্তাবে ও বাস্তব পক্ষে যুদ্ধ হয় নাই অথচ যুদ্ধ সম্ভাবনায় সৈন্য সমাবেশ হইয়াছিল, সেই সকল দেশের অধিবাসী সৈন্যসামন্তদের উৎসবের যে ছোট খাট নমুনা দেখিয়াছে, তাহা হইতে বিজয়ী ও বর্ব্বর জাপানীর জয়োৎসবের কর্ম্ম-সূচী (মেনু বলিব না প্রোগ্রাম বলিব, তাহাই ভাবিতেছি) কল্পনা করিয়া লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবার কথা নহে।

পুনরায় বঙ্কিমচন্দ্রের শরণ লইতে হইতেছে।

“মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই ; সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই ; ঘরে ঝি বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই ; ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই।”

বোধ করি অবস্থা ইহার চেয়েও শতগুণ সহস্রগুণ মন্দ হইয়াছিল। ভারতীয়দের অবস্থা অধিকতর মন্দ। তাহারা পরদেশী ত বটেই, অধিকন্তু সুদূর ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া বিদ্যা বুদ্ধি অধ্যবসায় বলে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বিত্তশালী হইয়াছে ; ধনরত্নের অধিকারী হইয়াছে, জাপানী দস্যুদের ‘সুদৃষ্টি’ তাহাদের পানে প্রধাবিত হইতে বাধ্য। আবার দেশীয় ‘গ্যাঁড়াতলা’ ও ‘কলাবাগান’-অধিবাসীর পক্ষেও ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ, অমৃতযোগ। ভারতীয়গণের অবস্থা, রামে মারিলেও মারিবে, রাবণও আস্ত রাখিবে না, কুচি কুচি করিয়া কাটিবে। আমাদের বাঙ্গলাদেশের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত এক পল্লীগ্রামে সিকি-সামরিক এক মাটী-কাটা কুলী-বাহিনীর রোষানলে পতিত হইয়া দিবা দ্বিপ্রহরে একটা আস্ত গ্রাম ভস্মাবশেষে পরিণত হইয়াছিল ইহা আমরা দেখিয়াছি ; ঐ কুলী বাহিনীর কামাগ্নির উত্তাপে

নারীত্ব উৎখাত হইতেছিল ইহা ত আমরা সকলেই শুনিয়াছি। অথচ বঙ্গদেশান্তর্গত সেই গ্রাম অরাজক নহে, বরং প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ-রাজক; ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া হইতে অগণিত অর্ডিন্যান্স দ্বারা সুশাসিত। পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, এ্যাডভাইসার, লাট, কম্যাণ্ডিং অফিসার, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, সাউথ ইষ্ট এসিয়া কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, ভাইসরয়, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেল, রেডিয়ো মুষ্টিগত থাকিতেও দিবা দ্বিপ্রহরে যখন এইরূপ অঘটন ঘটিতে পারে তখন বৃটিশ-পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলির অবস্থা অনায়াসে কল্পনা করা যাইতে পারে।

বৃটিশ-পরিত্যক্ত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অবস্থা চিন্তা করারও প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। দিল্লীর লালকেল্লায় অনুষ্ঠিত সামরিক আদালতের বিচারকালে প্রকাশ পাইয়াছিল যে বৃটিশ প্রভুরা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে জাপানীদের হাতে মেষ মহিষ গো ছাগের মত অর্পণ করিয়াছিলেন। সম্প্রদান কালে হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি পালনেও বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে জাপানীর করে সমর্পণ করিবার সময়ে এইরূপ মন্ত্র পঠিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়ঃ

> এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের যেরূপ আনুগত্য করিতে, অতঃপর জাপানীদের তদ্রূপ আনুগত্য করিবে; আমাদের যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে এখন হইতে ঐ খর্ব্বকায় মর্কটসদৃশ পীতবর্ণ জাপানীকে তদনুরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করিবে; এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের আজ্ঞা পালন করিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ, এখন হইতে ঐ নবীন প্রভুর প্রতি সেইরূপ আনুরক্তি দেখাইবে।

হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির সহিত সাদৃশ্য কতদূর নিকট, তাহা আপনারা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

বৃটিশ দান করিল, জাপানী গ্রহণ করিল, এ পর্য্যন্ত ঠিক; তারপর? জাপানীরা তাহাদের লইয়া কি করিবে? পঞ্চাশ ষাট হাজার (আরও অধিক হইতে পারে!) ভারতীয় 'পঙ্গপাল', তাহাদের কোন্ কাজে লাগিবে? যুদ্ধ-বন্দী—খাইতে দিতেই হইবে—অখাদ্য কুখাদ্য যাহাই হৌক, একেবারে না দিয়া উপায় নাই; অথচ তাহাদের দ্বারা কাজ পাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। যুদ্ধের কাজ তাহাদের দ্বারা হইবে না—হওয়া সম্ভব নহে। কারণ জাপানীরা মনে করে, আঠার কুড়ি টাকা মাহিনার জন্য যাহারা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তাহারা ঘোড়ার ঘাস কাটিবার যোগ্য; তদপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাহাদের দেওয়া যায় না। ঘোড়ার ঘাস কাটা, রাস্তার জঙ্গল সাফ, মোট বহা, এগুলা পারিলেও পারিতে পারে কিন্তু এই কাজের বিনিময়ে খাইতে দিতে হইবে।

যুদ্ধের কাজ ভারতীয় পঙ্গপালদের দ্বারা হইবে না জানিয়াও, জাপানীরা পঙ্গপালগুলিকে হাত ছাড়া করিতে চাহিল না। গৃহস্থ মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া যেমন ভিখারী তুষ্ট করে, তাহারাও সেইভাবে ভারতীয়গণকে হাতে রাখিল। ভারতবর্ষ জয় করিবেই, ভারত ভূমিতে প্রবেশ—অনুপ্রবেশ করিবেই, তখন এই পঙ্গপালগুলা সঙ্গে থাকিলে ভারতীয়গণ শত্রুতা করিবে না, হয় ত সহায়তা করিতে পারে এইরূপ ধারণা জাপানী করিয়াছিল। বৃটিশের সহিত ভারতীয়গণের মধুর সম্পর্কের কাহিনী জাপানীদের অজ্ঞাত ছিল না। "কুইট ইণ্ডিয়া" সেই সুমধুর সম্বন্ধের সুষ্ঠু অভিব্যক্তি। কাজেই জাপানী আশা করিয়াছিল যে কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে। বিষের প্রতিক্রিয়া বিষ। ভারতবর্ষে পীত জাতির প্রতিষ্ঠা ভারতীয়গণের সহায়তার দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হইবে জাপানী এই দুরাশা পোষণ করিয়াছিল। ইতিহাস তাহার পক্ষে। বৃটিশ-বণিক বাঙ্গলাদেশের পলাশীতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত করিয়াছিল কাহার সাহায্যে?

জাপান কি ক্ষণতরেও ভাবিয়াছিল যে এই পঙ্গপাল উল্টা করিলি রাম করিয়া বসিবে ? বৃটিশ উচ্ছেদ তাহাদের কাম্য ছিল, ইহাই তাহারা জানিত ; সঙ্গে সঙ্গে জাপানী উৎসাদনও যে তাহাদের কাম্য হইয়া আছে, জাপানী তাহা একটিবারও ভাবিতে পারে নাই।

এখন পর্য্যন্ত যতটুকু ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে উচ্চাকাঙ্খার সুখ-স্বপ্নটি সর্ব্বপ্রথম মোহন সিংহের হৃদয়ে জাগরুক হইয়াছিল। জাপানী খোঁয়াড়ে ছাগল ভেড়া গো মহিষ শূকরের জীবন যাপন করিতে করিতেও, স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন মোহন সিংহই দেখিয়াছিল।

যে ছবি সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, দেখিয়া মুগ্ধ-মোহিত হইয়াছিল, সেই ছবি যখন সে জাপানী খোঁয়াড়ে ভারতীয়গণ সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিল, তখন এক সুরে বাঁধা সেতারের তারে স্বদেশের গান বাজিয়া উঠিল। বৃটিশের ব্যবহারে বৃটিশের উপর কেহই সন্তুষ্ট ছিল না। বৃটিশ যে ছাগ মেষের মত তাহাদিগকে জাপানী করকমলে সমর্পণ করিয়া পলায়ন করিবে ইহা তাহারা কল্পনা করিতেও পারে নাই। পরে যখন অকল্পিত অবস্থা বাস্তব রূপ ধারণ করিল, তখন অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা বৃটিশের প্রতি এক তিল শ্রদ্ধা বা ভক্তি রহিল না। মোহন সিংহের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়া গেল।

স্বদেশ উদ্ধার, ভারতের শৃঙ্খল মোচন, মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির কামনাই যে সকলের অন্তরের সপ্তস্বরায় ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আবার এ কথাও বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় না যে এমন হৃদয়ের অভাব ছিল যে হৃদয়ের তন্ত্রীতে মহতী আকাঙ্খার ঝঙ্কার না ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। বৃটিশ যে শৃগাল-নীতির পরিচয় দিয়াছে তাহাতে এ কথা মনে করাও অবাস্তব ছিল না যে জাপানী অগ্রসর হইতে থাকিলে ভারতবর্ষ হইতে তল্পী তল্পা বাঁধিতেও বৃটিশ বিরত থাকিবে না। অরক্ষিত ভারতবর্ষে

ঢুকিয়া তাহারাই একটা রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। মোহন সিংহ যদি এই উচ্চাশায় বুক বাঁধিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার নামও স্মরণীয় থাকিবার যোগ্য। মোহন সিংহ সংগঠন কার্য্য ভালই করিয়াছিল। পঙ্গপালগুলিকে একত্রিত ও একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দুরতিক্রম্য সঙ্ঘশক্তি প্রদর্শন করিয়া জাপানীকেও দুশ্চিন্তায় ফেলিয়াছিল।

পঙ্গপাল যে সত্যই পঙ্গপাল নহে, তাহা বুঝিতে পীতজাতির বেশী বিলম্ব হয় নাই। অল্পকাল মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে, এই পঙ্গপাল যত বৃটিশ বিদ্বেষী হোক না কেন, শ্বেত খেদাইয়া পীত বরণ করিবে না। ইহাদের সহায়তায় বৃটিশের বাড়া ভাতে 'গরস' বসানো সম্ভব হইবে না। তখন সমরশাস্ত্রের শরণ লইয়া, সামরিক স্তোভ বাক্যের তুবড়ি ফুটাইতে সুরু করিল।

এসিয়া এসিয়াবাসীর জন্য
এসিয়ায় এসিয়াবাসিদের পারস্পরিক সমৃদ্ধি সাধন
ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত

ছুঁচ হইয়া অনুপ্রবেশ করিবার পক্ষে বুলিগুলি শ্রুতিসুখকর ত বটেই!

মহাসমুদ্রের ওপারে বসিয়া ইংলণ্ড-আমেরিকার সর্ব্বাধিনায়কগণও চার্টারের পর চার্টার রচনা করিতেছিলেন।

বাক্যে স্বাধীনতা
কর্ম্মে স্বাধীনতা
চিন্তায় স্বাধীনতা
স্বাধীনতা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজাতির অবশ্যপ্রাপ্য সম্পদ

শুনিতে এগুলা কি কম মিষ্ট? কম মধুর? কম আশাপ্রদ?

যুদ্ধকালীন—চার্টার—প্রতিশ্রুতির মূল্য কিরূপ, যুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর পরাধীন দেশ ও পরপদানত জাতিগুলির তাহা জানিতে

বাকী রহিল না। জাপানীর পারস্পরিক সমৃদ্ধি-সাধন প্রতিশ্রুতির অকাল বিসর্জ্জন না ঘটিলে, তাহাও যে অতলান্তিক চার্টারেরই মত অমূল্য—মহামূল্য প্রমাণিত হইত, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। জাপানীর প্রতিশ্রুতিতে ভারতবাসী আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারিয়াছিল বলিয়া আমরা জানি না। বরং মনে মনে ইহাই তাহারা জানিত—

যে আসে লঙ্কায়
সেই হয় দশানন।

ভারতবর্ষের কথা ঐ। দেশান্তরে ভারতবাসিদেরও ঐ কথা। মোহন সিংহ ঐ কথা জাপানীকে বুঝাইয়া দিয়াছিল এবং তাহার ফলে সুহৃদ্বর মোহন সিংহকে জাপানীর হাতে লাঞ্ছনাও বড় কম সহিতে হয় নাই। জাপানীরা মোহন সিংহকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেও দ্বিধা করে নাই। এই সময়ে বিশৃঙ্খলার সূচনা দেখা গিয়াছিল। নাবিকবিহীন তরণীর মত ভারতীয়-সমাজও লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতেছিল। শা নওয়াজ খান এই সময়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন। স্বাধীনতার বহ্নিশিখা ভারতীয়গণের অন্ধকার অন্তঃকরণে তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রজ্জ্বালিত করেন। রাসবিহারী বোস সেই বহ্নিশিখাকে অধিকতর প্রোজ্জ্বল করিয়াছিলেন—করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই স্বাধীনতা সঙ্ঘ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল! পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্খা তিনিই ভারতীয়গণের শূন্য হৃদয়ে জাগরিত ও সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সময়ে ভারতীয়গণের মনের মধ্যে আর একটা ভাব জাগরূক ছিল। যে বৃটিশের জন্য তাহারা জান দিতে আসিয়াছিল—কত লোক ইহারই মধ্যে প্রাণে মরিয়া গিয়াছে, সেই বৃটিশ যে তাহাদিগকে নেকড়ের মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে,

সেই বৃটিশের অনিষ্ট—এমন কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিলেই যেন আত্মার পরিতৃপ্তি ঘটে !

এই কথাগুলা এখানে না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইত।

ক্ষেত্র প্রস্তুত, বারুদ স্তূপীকৃত সজ্জিত—একটি স্ফুলিঙ্গের প্রতীক্ষা ! সুভাষচন্দ্র সেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। বারুদের স্তূপে স্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইল ; জয় হিন্দ রবে ভারতীয় নরনারীর করধৃত বন্দুক গর্জ্জন করিল।

ব্যাঙ্কক কাঁপিল, সিঙ্গাপুর কাঁপিল, ব্রহ্ম কাঁপিল ; ভারতে বসিয়া বৃটিশ কাঁপিল ; অতলান্তিক পারে আমেরিকা কাঁপিল ; প্রশান্ত মহাসমুদ্রে অষ্ট্রেলিয়া কাঁপিল ; আফ্রিকা কাঁপিল।

সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয় না ; বেতার যন্ত্রের চাবি ঘুরাইয়া নাজেহাল হইতে হয়, কোন খবরই পাওয়া যায় না—ভারতবর্ষ নেতৃবিহীন ; শাসকের শাসনচক্রের নির্ঘোষ ছাড়া বিশাল ভারতবর্ষ অজানা আশঙ্কায় অধীর হইলেও স্তব্ধ, সর্ব্বত্র থম্ থমে ভাব একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তাহারই মাঝে—কেমন করিয়া কেহ জানে না, ভারতবর্ষ নূতন কথা শুনিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে যে কথা শুনে নাই অথচ যে কথা শুনিবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রবণেন্দ্রিয়মূলে একীভূত করিয়া রাখিয়াছে, কে জানে কোন্ সূত্রে—বুঝি বা বাষ্পের মুখে, বুঝি বা বায়ু মুখে শুনিল, ভারতের বাহিরে ভারত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না—অসম্ভবে কে বিশ্বাস করে ? তবু আকাশে কাণ পাতিয়া রহিল, অলক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল।

জয় হিন্দ—ভারতের জয়—স্বপ্নে শোনা এই বাণীর বীণাপানি মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সারা ভারতবর্ষ নিদ্রাজয়ী ভীষ্মের মত, ইন্দ্রিয়বিজয়ী রামানুজ লক্ষ্মণের মত সজাগ, সতর্ক রহিল।

আর বাঙ্গালী? বাঙ্গালী তাহার অবারিত, অবিরাম, অবিরল বীর পূজার বর লাভাশায় উদগ্রীব, অধীর হৃদয়ে দিবসশর্ব্বরী অতিবাহিত করিতে লাগিল।

"লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ;
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।"

বন্দে মাতরম্।

জয় হিন্দ!

অষ্টম স্তর—সমিধ

I have failed

শা নওয়াজ খানের কথা আমাকে আগে বা পরে কিছু বলিতে হইবে। এই মানুষটিকে জানিবার, চিনিবার ও বুঝিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাজার প্রতি আনুগত্য, তাহার নিয়োগকর্ত্তার প্রতি আনুগত্য, সহকর্ম্মিগণের প্রতি আনুগত্য ভঙ্গ করিয়া, সমর-শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান-বৈশিষ্ট্য শৃঙ্খলা বিনষ্ট করিয়া এই লোকটি রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল; সাম্রাজ্যবাহিনীর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অস্ত্র যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই রণরঙ্গে তাহার সহসৈনিকদের হত ও আহত করিয়াছিল। যুদ্ধস্থলে এরূপ ঘটনা ঘটে না; ঘটিবার সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু এবার তাহা ঘটিয়াছিল। বৃটিশ বাহিনীর লোক, বৃটিশ বাহিনীর লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত করিয়াছিল। বিশ্বাস করা কঠিন বটে, কিন্তু বিশ্বাস না করিয়াও উপায় নাই। দিল্লীর লালকেল্লায় শা নওয়াজ খান, ধীলন ও সায়গলের বিচার হয়। এই অভিনব অভিযোগের, অভিনব বাহিনীর বিচারেও অভিনবত্ব দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই জন্য যে কয়দিন এই অভিনব মামলার বিচার চলিয়াছিল, সমগ্র ভারতবর্ষ—সশস্ত্র ভারত ও নিরস্ত্র ভারত—দিল্লীর সেই বিচারালয়ের পানে স্থিরনিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া অবরুদ্ধ-নিঃশ্বাসে যেন জীবন মরণের দণ্ডপলতিথি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। ভারতবর্ষের মর্য্যাদা ঐ তিনটি মানুষের আচরণের উপরে নির্ভর করিতেছিল। একটা বিশাল মহাদেশের কোটী কোটী মানুষের মনঃপ্রাণ, কামনা বাসনার এমন একান্ত ঐকান্তিকতা ইতিহাসে বিরল।

অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, দিল্লীতে এই বিচার!

এই দিল্লী ছিল, তাহাদের লক্ষ্য; "দিল্লী চলো" ছিল তাহাদের রণধ্বনি।

অদৃষ্টের পরিহাস বৈ আর কি!

লাল কেল্লার এই বিচারালয় পৃথিবীর আইন সভার মর্য্যাদা পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইয়ের দান বিশ্বের আইনের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিচারফল যাহাই হৌক, সর্ব্বাধিনায়ক (কমাণ্ডার-ইন্ চীফ) তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। ১৯৪৬ খৃঃ অব্দের ২২এ জানুয়ারী শা নওয়াজ খান কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ২৩এ জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব হইতে, ২৬এ জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কলিকাতা মহানগরী, সুভাষের ভারতীয় বাহিনীর মুক্তিপ্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষ শা নওয়াজ খানকে কেন্দ্র করিয়া উল্লাসে, উৎসাহে, আনন্দে উদ্বেল উৎফুল্ল ও মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল। নেতাজীর অনুচর শা নওয়াজ খান নেতাজীর নিবাসমন্দিরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

তিনি বিমানে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। দম দম বিমান কেন্দ্র হইতে বন্ধু পরিজনগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া এলগিন রোডে আনয়ন করেন।

শ্রীমতী অমিতা মিত্র নেতাজীর সহচর বীরকে বরণ করেন। বরণ প্রথা আমাদের প্রথা—ভারতবর্ষে—বাঙ্গলাদেশে বর বরণ, কন্যা বরণ, গুরু পুরোহিত বরণ হইতে বীর বরণ—রাজ বরণ, বরণের প্রথা পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। গল্প কথায় শুনিয়াছি, এই মহানগরীতে, ইংলণ্ডের রাজা ও রাজকুমারকে কোনও সময়ে কেহ কেহ বরণ করিয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের নৈকট্য ভঙ্গ ও রাজা-প্রজার সম্পর্ক তিক্ত এবং বিষাক্ত না হইলে,

উত্তরকালে, ভারতবাসী ভারতবর্ষে সমাগত রাজপুত্রকে বরণ করিয়া লইতেও দ্বিধা করিত না। ভারতবর্ষের ইতিহাস অতীব বিচিত্র। রাজার পাদুকাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া রাজপূজা এই ভারত-বর্ষই করিয়াছে। ভারতবর্ষের পঞ্জিকায় আজও রাজদর্শন মহাপুণ্যের ফল বলিয়া বিঘোষিত করে। একজন রাজকুমার পারিবারিক চক্রান্তে বনবাস গমন করিলে সমগ্র রাজ্য ও রাজ্যের সমস্ত প্রজা নির্ব্বাসনে যাইতে উদ্যত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বিবেচনা করিত ; এখনও ভারতের অন্তরে সেই সংস্কার বদ্ধমূল। তথাপি যে ইংলণ্ডের রাজার কুমারকে বিনা বরণে, বিনা অভ্যর্থনায় ভারত ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল কেন, শত সহস্র বৎসরের সংস্কারের বিপক্ষতা করিতে হইয়াছিল কেন, তাহা জানে না, এমন লোক ইংলণ্ডেও নাই, ভারতেও নাই। রাজবরণের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় রচিত হইয়া গিয়াছে ; পুনর্মুদ্রণের সম্ভাবনা আর নাই। বাঙ্গলা দেশে বীর-বরণের ইতিবৃত্ত আমাদের জানা নাই। জানা নাই এই কারণে যে, বীর আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারেন এমন বীরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। দীর্ঘকালের অবসাদতমিস্রাবৃত, কলঙ্ককালিমাচ্ছন্ন ঘৃণিত ইতিবৃত্তের অবসানে আবার আজ বাঙ্গালী বীরত্বের সন্ধান পাইয়াছে ; শৌর্য্যের গৌরব দীপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে ; বীর্য্যের সুষমা বায়ুভরে উড়িয়া আসিয়া বসন্তে রমিত ফুলবনের মত বঙ্গদেশকে মাতাইয়া দিয়াছে। তাই আজ বঙ্গ রমণী তাহার হারাণো বরণডালা করে বীর বরণে অগ্রসর হইয়াছে। কল্যাণী অমিতা আরও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। শোণিত-লিখায় শা নওয়াজ খানের ললাটে রাজটীকা—বীর লিখা আঁকিয়া দিয়াছেন। পরাধীন ভারতের ইতিহাসে শা নওয়াজ খান অমর। বাঙ্গলার ইতিহাসে বীর-নারী অমিতার নামও অক্ষয় হৌক।

বীর-জায়া বীরের মর্য্যাদা বুঝে। তাই চন্দন-লিখায় তাহার মন

উঠে নাই; সিন্দূর বিন্দু অমিতার মনঃপূত হয় নাই। নিজ চম্পক-অঙ্গুলি ছেদন করিয়া সেই রক্তের তিলক লিখিয়া দিয়াছে। এই অমিতার স্বামী বৃটিশের আদালতে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। গান্ধীজী বৃটিশের নিকট করজোড়ে অনুকম্পা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন; বৃটিশ গান্ধীজীর আকুতি অবহেলা করে নাই, মুক্তি ভিক্ষা দিয়াছে! হরিদাস মিত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। হরিদাসের অপরাধ, সে বৃটিশের শত্রুর সহিত সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিল। অপরাধ গুরুতর—সন্দেহ নাই! কিন্তু উদ্দেশ্য, আত্মস্বার্থ নহে; আত্মহিত নহে, ভারতের উদ্ধার সাধন; স্বদেশের মুক্তি কামনা।

কে বলিতে পারে, সুন্দরী বঙ্গরমণীর করধৃত বরণডালাখানি যখন বীর বরণ করিতেছিল তখন কারান্তরালবাসী আর একজন বীরের কথা শীতের কুজ্ঝটিকার মত তাহার অন্তরতলে অন্ধকারের সৃষ্টি করিতেছিল কি না! উদাস দুটি নয়নের নীচে বিচ্ছেদ সাগর তরঙ্গায়িত হইতেছিল কি না—তাই বা কে বলিতে পারে! কম্পিত দু'খানি অধর-ওষ্ঠের তলে রোদনসমুদ্র আছাড় বিছাড় করিতেছিল কি না তাহাই বা কে বলিতে পারে?

কেহ না! কেহ না! কেহ না! তাহার কথা সেই জানে! অপরে তাহা জানিতে পারে না; পারা সম্ভব নহে!

"কি যাতনা বিষে
সে জানিবে কিসে?
কভু আশিবিষে
দংশেনি যারে!"

কিন্তু বাঙ্গলার মেয়ে, বাঙ্গালীর বধূ, আপনাকে বিলোপ করিতে তাহার বিলম্ব হয় না।

শা নওয়াজ খানের দৃষ্টি সেখানে নাই; মন কোথায়, তাহাই বা কে জানে। তাহার দৃষ্টি যেন অদেখা কিছু দেখিবার তরে,

তাহার অন্তর যেন অজানা কিছু জানিবার আশায় আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। তাহার যেন, একটি মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহ্যাতীত। বৈষ্ণব যেমন, নদীয়ায় গিয়া নদীয়ার মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া মানব দেহ পবিত্রিত করিতে চাহে, সেও তাহার নেতাজীর আবাস-মন্দিরটিকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ধন্য হইতে চাহিতেছিল।

সেই কক্ষ! কতদিন কত কাজে, কত হর্ষ বিষাদে, কত বার গিয়াছি। উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, মিত্র বৈরী, দেশী বিদেশী কত লোক কত ছলে কত বার গিয়াছে—সেই কক্ষ। এই সেদিন গান্ধীজী এই কক্ষে আসিয়া বসিয়াছিলেন ; এইখানে বসিয়া অতীতের সুখস্মৃতি প্রেম-প্রীতি বিমণ্ডিত সফলতা-বিফলতার হাসি-অশ্রুভরা কত কথাই বলিয়া গিয়াছেন। সেই ঘর তেমনই সজ্জিত—শোভিত ; মনে হইবে, সুভাষচন্দ্র বুঝি বাহিরে গিয়াছেন, এখনই ফিরিবেন। এই কক্ষসন্নিধানে সেদিনও জনতা জমিত ; আজও জনতা অপেক্ষমান। কেদারার উপরে সুভাষের সেই ছবিখানি—কেশবিরল গৌরসুন্দর আনন, খদ্দরের অঙ্গ-বাস ; আজ একটি মালা পরিয়াছে। গাঁদার মালা। গৌর অঙ্গে গৈরিক বসন—গৌর-নিতাই সম্মিলন।

শা নওয়াজ খান ভদ্র ও ভাল মানুষটির মত সিঁড়ি উঠিলেন, তোমাতে আমাতে তাঁহাতে কোনও তারতম্য নাই, হঠাৎ ঘরের সম্মুখে আসিয়া সেই ভীষণ মোটা জুতা ভীষণ শব্দ করিয়া উঠিল—শা নওয়াজ!—ফলইন! জয় হিন্দ! এক দুই তিন মুহূর্ত্ত। তারপর গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই ছবি—তাঁহার নেতাজীর সেই ছবিখানি সবলে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, সেকি বালকের কান্না ; সেকি নারীর ক্রন্দন! কোথায় ছিল এত জল? পাষাণের তলে সাগরের উচ্ছ্বাস কত দিন ছিল, লুকানো ; কত কাল ছিল, গোপনে? অবরোধে? কে উন্মুক্ত করিয়া দিল অশ্রুর উৎস!

হায় বীর! হা শা নওয়াজ! ক্রন্দন কি তোমায় শোভা পায়?

কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুঅবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে শা নওয়াজ খান কহিতে লাগিলেন, "আর একদিন, আর একদিন নেতাজি, তোমাকে আমি এমনি জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। যেদিন ভারতভূমিতে প্রথম পদার্পণ করিবার জন্য সুভাষ ব্রিগেডের নেতৃত্ব, নেতাজি, নেতাজি, তুমি তোমার এই অক্ষম অধম অনুচরকে দিয়াছিলে! সেদিন তুমি ছিলে মানুষ, আমি তোমার দাস; আজও আমি সেই দাসই আছি; কিন্তু দেবতা আমার, নেতাজী আমার, তুমি কোথায়?" ছবি ছাড়িয়া জানালা, জানালা হইতে আলনা, আলনা ছাড়িয়া দরজায়, দুটি চক্ষুতে শতধারা বহিয়া যাইতেছে; সম্বদ্ধৌষ্ঠাধর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! ভোগবতী বসুধা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উঠিতে চাহে, বসুমতী অতি কষ্টে দমিত রাখিয়াছেন। কিন্তু আর বুঝি সম্ভব নহে, বসুমতী পরাভূত! ধরিত্রী বুঝি বা ভাসিয়া যায়!

সুভাষের সেই শয্যা! শা নওয়াজ খান খাটের নীচে জানু পাতিয়া শয্যায় মুখ লুকাইলেন; চোখের জলে চাদর ভিজিল; উপাধান সিক্ত হইল। চাহিয়া দেখি, ঘরের চারিদিকে যত চোখ— সব চোখে জল ছল ছল ঢল ঢল! মেঘে মেঘে মিলন বিজলী ঝলসিয়া উঠে; চোখে চোখ পড়িলে প্লাবন বহে!

মেজর জেনেরাল শা নওয়াজ তখনও চাদরে মুখ ঘসিতেছেন আর অতি মৃদু, অতি ধীর, অপরাধীর কণ্ঠে বলিতেছেন, নেতাজি, আমি পারি নাই; নেতাজি, আমি পারি নাই (I have failed! I have failed)! নেতাজি, আমায় ক্ষমা করুন, আমি পারি নাই! আমি পারি নাই!

নেতাজী কোথায় জানি না! যেখানে থাকুন, বীর অনুচরকে তিনি যে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছেন, তাহা জানি! আর শা নওয়াজ খানকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেও পারি, হে বীর!

তোমার ব্যর্থতাও বিজয়মণ্ডিত হইয়াছে। তোমার নেতাজীর পুণ্যে ভারতবর্ষ শতাব্দীর পথ এক নিমিষে অতিক্রম করিয়াছে। তোমার নেতাজী ধন্য, নেতাজীর অনুচর তোমরা, তোমরাও ধন্য!

বাহিরে জনারণ্য। মহানগরীর একাংশ আজ যেন এইখানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেই বিপুল জনসমাবেশ, কেহ দেখিতে পায়, কেহ পায় না; কথা কাহারও কাণে যায়, কাহারও যায় না; কিন্তু তাহাতে বিরক্তি নাই, হতাশা নাই, রোষ ক্ষোভ দুঃখ নাই! বিশাল জনতা, যেন অপেক্ষা করিয়াই পরিতৃপ্ত!

অকস্মাৎ বাহিরে কে রব তুলিল, শা নওয়াজ জিন্দাবাদ!

মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া মেজর জেনেরাল শা নওয়াজ বাহিরে আসিয়া, সিংহনাদ করিলেন—নেতাজী জিন্দাবাদ!

জনতা আত্ম-ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়া, গগনবিকম্পিত করিয়া, সহস্রকণ্ঠে কহিল, নেতাজী জিন্দাবাদ!

—জয় হিন্দ!

জয় হিন্দ!

২

একি সত্য সত্য সেই শা নওয়াজ খান? এই শিশুর মত দুর্ব্বল, নারীর মত অসহায়, সদ্যঃবিধবা হিন্দু সতীসাধ্বীর মত ক্রন্দন করিতেছে, এই কি সেই দুর্দ্ধর্ষ শা নওয়াজ খান, বাস্তবপক্ষে যে ব্যক্তি ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর গঠয়িতা? এ কি সত্যই সেই? আই-এন্-এ বলে, এই শা নওয়াজ খানই ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত, বহুধা বিচ্ছিন্ন, আশাভরসাহীন, উৎসাহবিহীন, বিড়ম্বিত-জীবন ভারতীয়-গণকে একত্রিত করিয়া, তাহাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করিয়া, নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, নবজীবনের গান শুনাইয়া, শক্তিশালী বাহিনী রচনা করিয়াছিল। মোহন সিং আই-এন্-এর সর্ব্বপ্রথম সংগঠক

হইলেও, মনোভঙ্গ ও আশাহত ভারতীয় হৃদয়ে আশার আলোক প্রজ্বালিত করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। যাবজ্জীবন-প্রবাসী, ভারত-প্রেমিক রাসবিহারী বসুও অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া, ভারতবর্ষীয়-গণের অন্তরে আশানুরূপ উৎসাহ অনল প্রদীপ্ত করিতে পারেন নাই। রাসবিহারী বসুর মধ্যে স্বদেশপ্রেমের যে অনল বহুকাল ধরিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকচ্ছটা ভারতীয়গণকে উদ্বুদ্ধ করিলেও, নানা কারণে ক্ষণপ্রভা বিদ্যুল্লতার মত ক্ষণে ক্ষণে আলোকে উদ্ভাসিত করে; আবার ক্ষণে ক্ষণে যে তিমির সেই তিমির! এই শা নওয়াজ খানের শৌর্য্যের দীপ্তি, চরিত্রের মাধুর্য্য, প্রীতিপূর্ণ অমায়িক আচরণ উচ্চ নীচ সর্ব্ব স্তরে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই প্রভাবই এক সূত্রে গাঁথিয়া, এক মন্ত্রে বাঁধিয়া ভারতীয়গণকে এক লক্ষ্যের পানে, এক উদ্দেশ্য সাধনে উদ্বোধিত করিয়াছিল।

এই শা নওয়াজ খানই ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে নেতৃত্বে বরণ করিবার অভিলাষ সর্ব্ব প্রথম ব্যক্ত করেন। এই শা নওয়াজ খানই জাপানী সমরনায়কদের অনুরোধ করেন, ভারতীয়গণের দুর্দ্দশার সংবাদ বার্লিনে সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট প্রেরণ করিতে। জাপানীরা টাল বাহানা করিতে থাকে। সুভাষ বোস্ কি আসিবেন? আসিলেও, কি বা করিবেন? আর আসিবেনই বা কিরূপে? পথ বিঘ্ন সঙ্কুল—জলে মাইন, আকাশে বোমারু। তাঁহার আসা সম্ভব হইবে না।

শা নওয়াজ খান জাপানীর এই সকল খঞ্জ ও পঙ্গু কৈফিয়তে তুষ্ট হইতে পারে নাই। সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎসূত্রে পরিচয় না থাকিলেও সুভাষচন্দ্রের বাস্তব পরিচয় তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি জানিতেন, লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর শোচনীয় দুর্দ্দশার সংবাদ জানিলে সুভাষ বসু স্থির থাকিতে পারিবেন না। জীবন তুচ্ছ, বাধা

বিঘ্ন তুচ্ছ, সংবাদ শুনিবামাত্র দুঃস্থ দেশবাসীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে লহমা বিলম্ব করিবেন না। জাপানী সমর-অধ্যক্ষগণের আশঙ্কা ছিল যে, বোস আসিলে, তাঁহার উপর—সেই সঙ্গে ভারতীয়দিগের উপর জাপানীদের কর্ত্তৃত্বের আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তাঁবেদারী ধাতুতে সুভাষ বোস নির্ম্মিত হয় নাই—সুভাষ বোস মোহন সিংও নহে, রাসবিহারীও নহে, সে সুভাষ বোস! দেশে থাকিতে গান্ধীকে ফাইট্ দিয়াছে; বৃটিশের চোখে ধূলি দিয়াছে। জাপানী হুকুম দিবে, সুভাষ বোস পালন করিবে, এ দুরাশা জাপানীর ছিল না; বরং আশঙ্কা ছিল, সুভাষ ভারতীয়গণকে লইয়া নূতন অগ্নি না জ্বালায়! সে আগুন জাপানীকে না দগ্ধ করে।

কিন্তু, তখন, শা নওয়াজ খানের পরামর্শ না মানিলেও চলে না। জাপান যে পর্য্যন্ত আসিয়াছে, আসিয়াছে—সম্মুখে অন্ধকার! ভারতীয়গণের সহায়তা ব্যতীত অন্ধকারে অজানা পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা জাপানী বার্লিনে সংবাদ পাঠাইল।

আকাশে বাতাসে মানুষের মনে মুখে "হাঁ" ও "না" এই দুটি শব্দই তখন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কেহ বলে, হাঁ, আসিবেন। কেহ ভাবে, কিরূপে আসিবেন? কেহ সন্দেহ করে, আসিবেন না।

এই শা নওয়াজ খান বলিয়াছিল, আসিবেন, তিনি আসিবেন। আমাদের এই দুর্দ্দশা, আমাদের এই দুরবস্থা, আমাদের এই অসহায় পশুবৎ জীবনের কাহিনী শুনিলে তাঁহার অশান্ত হৃদয় এক মুহূর্ত্ত ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিবে না; তিনি আসিবেন। আমার অন্তর বলিতেছে, আসিবেন; আমার হৃদয়মধ্যে আমি তাঁহার পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি; আমার কাণের ভিতরে আমি সেই ধীর গম্ভীর মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইতেছি; তিনি আসিবেন।

অনন্তবিস্তৃত নিরাশার অন্ধকারে আশার বর্ত্তিকাটি হস্তে এই শা নওয়াজ খান ভারতীয়গণের আশা-ভরসাশূন্য চিত্তে আশা, উৎসাহ ও

প্রেরণা দিতেন। আশা-ভরসার স্বর্ণ শৃঙ্খল গড়িয়া এই শা নওয়াজ খানই ভারতীয়গণকে একতাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যেদিন সত্যসত্যই সুভাষ আসিলেন, কাগজে কলমে ও সভামঞ্চে রাসবিহারী বসু সুভাষকে ভারতীয় বাহিনীর ভার অর্পণ করিলেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিপীড়িত নির্য্যাতিত ভারতীয় সমাজটিকে এই শা নওয়াজ খানই সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিলেন। শুধু তুলিয়া দিলেন বলিলে যেন সবটুকু বলা হয় না ; বলিতে হয়, তুলিয়া দিয়া ধন্য হইলেন।

শা নওয়াজ খান ধন্য হইলেন, দুইটি কারণে।

এতদিন পর্য্যন্ত তিনিই পরম দক্ষতার সহিত, মাতৃসম স্নেহে, রক্ষকসম যত্নে নিপীড়িত, পরিত্যক্ত ও আশাহত ভারতবর্ষীয় নর-নারীগুলিকে একত্রিত করিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, আজ যোগ্যতম ব্যক্তির উপরে তাহাদের ভার তুলিয়া দিয়া যে তৃপ্তি উপভোগ করিলেন তাহাতে জীবন ধন্য বোধ হওয়ারই কথা। আর এই সুদূর বিদেশে, দেশের সহিত, মাতৃভূমির সহিত, আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে এমন একজন ব্যক্তির আগমন ঘটিয়াছে, একদিন ভারতে চল্লিশ কোটী নরনারী যাহার শিরে জাতির গৌরব মুকুটখানি পরাইয়া দিয়াছিল। একদিন চল্লিশ কোটী নরনারী যাহাকে তাহাদের পরিচালক বোধে আনুগত্যের শপথ লইয়াছিল। শা নওয়াজ খান সেই লোকের হস্তে অসহায় দেশ-বাসীকে তুলিয়া দিলেন। তাহাদের শুভাশুভ, তাহাদের মরণ বাঁচনের দায়—তাঁহার !

শা নওয়াজ খাঁ ধন্য হইবেন না ত কে ধন্য হইবে ! ভগবান যে এই বিরাট, বিশাল মঙ্গলজনক কার্য্য তাঁহার হাত দিয়া করাইলেন, তাঁহাকে নিমিত্ত করিয়া করিলেন, ইহা ভাবিয়াই শা নওয়াজ জীবন ধন্য জ্ঞান করিলেন।

আজ সুভাষ বোস তাহাদের সম্মুখে সুভাষ বোস নহে, আজ সুভাষই ভারতবর্ষ! যে মাতৃভূমির সহিত সম্বন্ধ চির তরে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল সেই মাতৃভূমি মুহূর্ত্তমধ্যে প্রভাসিত হইয়া উঠিল। সুভাষের মধ্যে তাহারা স্বদেশকে দেখিতে পাইল; স্বজনের দর্শন লভিল। যে স্বদেশ কত দূর দূরান্তরে, দেশ দেশান্তরে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, সুভাষ চোখের নিমিষে সেই দূরত্ব দূর করিয়া দিল। চিরদিনের চেনা, আজন্মকালের দেখা দেশ, অগণিত দেশবাসী যেন ঐ একটিমাত্র লোকের মধ্য দিয়া রূপ পরিগ্রহ করিল। এ যেন রূপকথার সেই আশ্চর্য্য প্রদীপ!

আশ্চর্য্য প্রদীপের সেই আলোক, কি আশ্চর্য্য তাহার দ্যুতি, কি অসামান্য তাহার মাধুর্য্য! যেখানে ছিল নিরাশায় আচ্ছন্ন নিরবচ্ছিন্ন ঘনান্ধকার, একমুহূর্ত্তে আশার তরুণ অরুণ আলোকে উদ্ভাসিত হইল হৃদয় প্রাঙ্গণ; যেখানে কামনা বাসনা স্নেহ প্রীতি অবলুপ্ত হইয়া শুধুই অবসাদ, শুধুই বিতৃষ্ণা, শুধুই বিক্ষোভের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কি উজ্জ্বলে মধুরে কঠোরে কোমলে মেঘে রৌদ্রে গঠিত এই আশ্চর্য্য প্রদীপের আলোক-মাধুর্য্য, পলকের মধ্যে মানবহৃদয়ের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত বিশুষ্ক বক্ষঃ মন্দাকিনীতে বন্যার জল ঢুকিয়া হিল্লোলে হিল্লোলে তরঙ্গে তরঙ্গে কামনা বাসনা স্নেহ প্রেম ও প্রীতি উথলিতে লাগিল। সেই চির উপেক্ষিত, চির অবজ্ঞাত দেশ, দেশলক্ষ্মীর মূর্ত্তি ধরিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়ের প্রসারিত দু'টি বাহু হারাধন বক্ষে ধারণ করিবার জন্য আনন্দে অধীর! আত্মীয় পরিজনের কল-কোলাহল কর্ণে যেন সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিতে লাগিল! একদিন স্বপ্নে বিচ্ছেদ হইয়াছিল, আবার একদিন স্বপ্নে মিলন। এই একটিমাত্র লোককে কেন্দ্র করিয়া শত সহস্রের লক্ষের হতাশা ও নিরাশার অন্ধকার দূরীভূত হইয়া আশার আলোকে, বাসনার পুলকে পুনরুদ্দীপ্ত ও পুনর্জীবিত হইতে

পারে কি পারে না, পারা সম্ভব কিম্বা অসম্ভব, এইখানে বসিয়া আমি কাগজে লিখিয়া, আর আমার পাঠিকা ও পাঠক তাহা পাঠ করিয়া, নির্দ্ধারণ—সে তর্কের নিরসন করিবেন ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। মহাসমুদ্রে টাইটানিক যেদিন বিনামেঘে, যুদ্ধবিহীন 'শান্তি'র কালে, ডুবিয়াছিল, নিমজ্জমান বিলাস-তরণী টাইটানিকের যাত্রী যদি সেইখানে কাহারও মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া থাকে; বিহারের বাসুকী যেদিন শিরশ্চালনা করিয়া সমগ্র বিহারকে শিলা ও স্তূপে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, বিহারবাসী সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে যদি কাহারও ভরসায়, কাহারও দয়ার উপরে নির্ভর করিয়া থাকে, কেবলমাত্র তাহারাই বুঝিতে পারিবে অকূলে কূল ও মরণে জীবন লভিবার জন্য মানুষ শেষ নিঃশ্বাসেও, আশায় উন্মুখ হয় কি-না।' তুমি আমি তাহাদের মনের কথা, অন্তরের ভাষা বুঝিতে পারিব কি! আমরা কেমন করিয়া বুঝিব যে, সেদিন সেই দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডের নরনারী সেই একটিমাত্র মানুষের আননে ঈশ্বরের আলোক সম্পাত দেখিয়া ধন্য হইয়াছিল! আমরা কেমন করিয়া বুঝিব যে সেই একটিমাত্র মানবের কণ্ঠে তাহারা বিশ্ববিধাতার আশীর্ব্বাণীয় মূর্চ্ছনা শুনিয়াছিল? আমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব যে, ঈশ্বর নাই অথবা তাঁহার দয়ার ভাণ্ডার, করুণার উৎস নিঃশেষে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ভাবিয়াই যাহারা জীবনে মরণের স্বাদ অনুভব করিতেছিল, তাহারাই সেই নবাগত মানবটিকে করুণাময় জগদীশ্বরের প্রেরিত ত্রাণকর্ত্তা ভাবিয়া নবজীবনের সঙ্গীত শুনিতে পাইয়া এবং সর্ব্বস্ব তাহারই হস্তে উৎসর্গীকৃত করিয়া দিয়া জীবন ধারণের আশায় ও আনন্দে সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সুভাষচন্দ্র তাহাদিগকে আশার বাণী শুনাইলেন। শুধু আশার বাণী নহে, ভরসার কথা শুনাইলেন। যে-কথা এ যুগে নয়, বিগত বহু যুগে নয়, এ শতাব্দীতে নয়, বিগত বহু শতাব্দীতেও নয়,

যে কথা কেহ শুনে নাই, কেহ শুনায় নাই, সেই কথা বলিলেন, সেই কথা শুনাইলেন। বলিলেন, দিল্লী চলো। পরাধীন ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলাম, পরাধীন ভারতবর্ষে ফিরিব না; চলো স্বাধীন ভারতবর্ষে যাই। দিল্লী চলো।

"দিল্লী চলো!"

আকাশে, বাতাসে, স্থলে জলে, মানুষের হৃদয়ের তারে তারে, আঁখির পলকে পলকে, বক্ষের স্পন্দনে স্পন্দনে নূতন কথা, নূতন শব্দ, নূতন গান ধ্বনিয়া উঠিয়াছে—

দিল্লী চলো।

কোথায় দিল্লী, কেন দিল্লী, কি বৃত্তান্ত কেহ জানে না কিন্তু কি মাদকতা, আর কথা নাই!

দিল্লী চলো!

সেই কণ্ঠস্বর—স্পষ্ট মধুর, উদাত্ত, গম্ভীর—প্রত্যেকটি শব্দে আন্তরিকতা: প্রত্যেকটি ছত্রে সহানুভূতি ও সমবেদনা! সেই কণ্ঠস্বর, যাহা ভারত অভ্যন্তরে ভারতবাসীকে মুগ্ধ, মোহিত করিত। সেই স্থির ধীর জলদগম্ভীর ভাষণ, যাহা একদিন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মানুষের চিত্ত উচাটন করিত। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিত নামিত আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নরনারীর অন্তর-যমুনা উজান বহিত।

শুনিয়াছি, বৃন্দাবনে নাকি এমনই একটা ঘটনা একদিন ঘটিয়াছিল। এক রাখাল বালকের বংশীধ্বনিতে কালিন্দী উজান বহিত; চিরোকিশোর এক গোপকুমারের বেণু রবে ষোড়শশত গোপাঙ্গনা আত্মহারা দিশেহারা হইত। সেই বংশীবাদকের করে নারী, জীবন যৌবন কুল মান সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ধন্য হইতে চাহিয়াছিল। যে অকবি, যে অপ্রেমিক এই সর্ব্বস্ব সমর্পণ, এই স্বর্ব্বোৎসর্গের মহিমা অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া কাম-কলুষ ঢালিয়া কলঙ্কের কাহিনী

রচনা করিয়া মানুষ মানুষীর চিত্ততলে চির প্রজ্বলিত কামানলে ঘৃত-আহুতি দিয়াছেন, তাঁহাকে ধিক্, তাঁহার কাব্য-রসে ধিক্, তাঁহার প্রেম দর্শনে শত ধিক্! ব্রজনারীর ব্রজেশ্বর সাধনার সূক্ষ্ম মর্ম্ম ভেদ করা তাঁহার সাধ্য নহে।

সুবিশাল সুবিস্তৃত দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়াখণ্ডের সমস্ত নরনারীর হৃদয়-যমুনা যে একটি লোকের একটি কথায় উজান বহিল কেন, কেন তাহারাও দেহ মনঃপ্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া—যাহাকে আত্মাহুতি বলে সেই আত্মাহুতি দান করিল, ইহা বুঝিবার মত মনোবৃত্তি যাঁহার নাই, তাঁহাকে বুঝাইতে পারি হেন শক্তি আমার নাই। তাঁহার পক্ষে আমার এই রচনা পাঠ বিড়ম্বনা মাত্র। আমি আর-যাঁহার জন্যই লিখি-না-কেন, তাঁহার জন্য যে লেখনী ধারণ করি নাই, তাহা নিশ্চিত।

সেই লোকটি বলিল, আজ আমাদের জীবনের মহা শুভক্ষণ—মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে, কিন্তু এমন সুযোগ, এমন সুবিধা কখনও আসে নাই, আজ আসিয়াছে। আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিকে আমরা বরণ করিয়া লইব; আজ সুযোগ ও সুবিধার সদ্ব্যবহার করিব। এমন সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। জীবন তুচ্ছ, প্রাণ যায়—যাক্। প্রাণ ত একদিন যাইবেই, অমরত্ব বর লইয়া কেহ ধরায় জন্মগ্রহণ করে নাই, একদিন ত মরিতেই হইবে। কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে, মনুষ্য জনমের শ্রেষ্ঠ সাধনা—স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিয়া মরিতে চাই। স্বদেশের স্বাধীনতাকামী সৈনিক যে পথের ধূলার উপরে শয়ন করিবে, সেই ধূলি হইবে স্বর্ণরেণু; সেই পথকে পৃথিবীর লোক স্বাধীনতার পথ বলিয়া পূজা করিবে।

মুগ্ধ নরনারী স্তব্ধ হইয়া নূতন কথা শুনিতে লাগিল।

সৈনিক যেদিন সৈন্য তালিকায় নাম লিখায়, সেইদিন, সেই

মুহূর্ত্ত হইতে মৃত্যুকে উপহাস করিতে শিক্ষা করে। অপরের সাম্রাজ্য, অপরের স্বার্থ, অপরের দেশ রক্ষার তরে কত শত লোক রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। আর আমরাও জীবন বিসর্জ্জন দিব। অপরের দেশ, অপরের স্বার্থ, অপরের সাম্রাজ্য রক্ষার্থ নয়, আমাদের সাধনার সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে এই জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিব। আমাদের প্রতাপসিংহ সে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন, আমাদের শিবাজী মহারাজ যে মরণ বরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছেন, দিল্লীর শেষ সম্রাট যে মৃত্যু লভিয়া ধন্য হইয়াছেন, বাঙ্গলার শেষ রাজা সিরাজদ্দৌলা যে স্বর্গ কামনায় শেষ রক্ত বিন্দু পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধর, তাঁহাদের উত্তরাধিকারী আমরা—আমরাও সেই গৌরবমৃত্যু বরণ করিব। দিল্লী চলো।

লক্ষ নরনারী লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, দিল্লী চলো।

কি উন্মাদনা ঐ দু'টি কথায়—দিল্লী চলো!

মানুষ অভিবাদন করে, লোকে প্রত্যাভিবাদন জানায়, দিল্লী চলো।

কুশল প্রশ্ন করে, কুশল জ্ঞাপন করে; বলে, দিল্লী চলো!

প্রেমের পারাবত কূজনেও বুঝি বা ঐ কাকলী—দিল্লী চলো!

৩

শা নওয়াজ খানের কথা বলিতে বলিতে প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া গিয়াছিলাম।

নেতাজীর মন্দিরাভ্যন্তরে ঢুকিয়া বীর শা নওয়াজ খানকে বালকের মত, নারীর মত ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সকলকেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। পুত্র শোকাতুর পিতার ক্রন্দন দেখিয়াছি; পিতৃহীন বালকের উচ্ছ্বসিত শোক দেখিয়াছি; স্নেহশীল মনিবের মৃত্যুতে অনুগত ভৃত্যের ক্রন্দনও দেখিয়াছি; নেতৃবিয়োগে জাতির ক্রন্দনও দেখিয়াছি কিন্তু শা নওয়াজ খানের শোক-প্রবাহের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারি কৈ?

নেতাজি, আমি পারি নাই, নেতাজি, আমি পারি নাই! এই শব্দ কয়টির অন্তরালে, মনে হইল সমস্ত ইতিহাস—ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ইতিহাসখানি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, শা নওয়াজের এই দুর্ব্বিসহ শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া অনেকে সন্দেহ করিতেছিলেন—যে সন্দেহকে মানুষ মন হইতে সবলে বিদূরিত—বিতাড়িত করিতে চাহে, আর, সেই যিনি সব জানেন, সব হৃদয় দেখিয়া থাকেন, সব করিতে পারেন, যাঁহাতে সকলের উৎপত্তি, সকলের নিবৃত্তি, তাঁহার নিকট নীরবে সন্দেহের অবসান কামনা করে—সন্দেহ করিতেছিলেন বুঝি বা সুভাষ নাই; বুঝি বা বঙ্গের গৌরব রবি চিরতরে অস্তমিত! জানি-না কেন, আমার কিন্তু সে কথা একবারও মনে হয় নাই।

কত লোক কত রকমই ত ভাবে—কত রকমই ভাবিতে পারে। মনের মুখে লাগাম কসিবার সাধ্য কাহার আছে? নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহচর সহকর্ম্মী সমধর্ম্মী বীর শা নওয়াজ খান যখন নেতাজীর আসন, নেতাজীর বসন, নেতাজীর শয্যা চুম্বন করে, আর অশ্রুর উৎস তাহার মুখ তাহার চোখ প্লাবিত করিয়া ধারায় ধারায় ঝরিতে থাকে, আর তাহার অবরুদ্ধ প্রায় কণ্ঠ ভেদ করিয়া মর্ম্মভেদী ব্যর্থতার বাণী পুনঃ পুনঃ বাহিরিয়া আসিতেছিল, তখন আমার মন, শা নওয়াজের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিল। আমার অভ্রান্ত দৃষ্টি, তাহার অন্তরের অভ্রান্ত অক্ষরে লিখা পাঠ করিয়াছিল।

"আমি পারি নাই! আমি পারি নাই, নেতাজি, আমি পারি নাই!" ইহার পরেই লিখা ছিল—যদি পারিতাম, নেতাজি, আজ এই শূন্য গৃহে আমাকে ঢুকিতে হইত না; নেতাজীর ঐ প্রতিকৃতির পরিবর্ত্তে সশরীরে নেতাজীই ঐখানে বসিয়া থাকিতেন। আমরা—তাঁহার দেশবাসী ছবির গলে মালা দিতাম না, নেতাজীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্য হইতাম।"

"আমাদের অভিযান যদি সার্থক হইত, অধীনতার পাশ বিমুক্ত ভারতবর্ষ যদ্যপি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে নেতাজী কি এলগিন রোডের এই বাড়ীতে বাস করিতেন ?

"সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র কি এই ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেন ?"

এই প্রশ্নের উত্তর নেতাজীই দিয়াছেন : জাপানের রাষ্ট্র ও রণনায়ক তোজো একদিন বলিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতে যে রাষ্ট্র-তন্ত্র স্থাপিত হইবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুই হইবেন তাহার প্রথম প্রেসিডেন্ট।

নেতাজী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। নেতাজীর আকর্ণ বদন-মণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল : রক্তিম অধর প্রান্তে অবজ্ঞা ও ঘৃণার তীব্র হাস্য ফুটিয়া উঠিল। দৃপ্তকণ্ঠে নেতাজী কহিলেন, ছিঃ, তুমি কি আমাকে এতই অসার, এমনই আত্মসর্ব্বস্ব মনে কর ? মহাত্মা গান্ধী জীবিত, মওলানা আবুল কালাম আজাদ রহিয়াছেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আছেন। তাঁহারা থাকিতে—আমি কে ?

তোজো হয় ত 'তা বটেই ত, তা বটেই ত' করিয়া কথাটা সামলাইয়া লইয়াছিল ; তাহা ছাড়া আর কি বা করিতে পারে ! বিংশ শতাব্দীর আত্মসর্ব্বস্ব আধুনিক জগৎ ভারতের শাশ্বত ও সনাতন মর্ম্মবাণীর কতটুকু খবর রাখে ? ভারতের সেই পরিচয় জানিবার কতটুকু চেষ্টা করে ? পিতার অন্যায় সত্য পালন করিতে রাজার কুমার রাজ্য, রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া বনবাসে যাইতে পারে, এই ভারতবর্ষে ! ভ্রাতার পাদুকাযুগল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া পাদুকার প্রতিনিধি হইয়া সাম্রাজ্য পরিচালনা ভারতবর্ষের মানুষই করিয়াছে। রাজার ঝি, রাজার ঘরণী রাজগৃহ, রাজসুখ, রাজ-ভোগ ফেলিয়া চীর ধারণ করিয়া স্বামীর সঙ্গে বনের মাঝে পর্ণ-কুটীরে বাস ভারতের নারীই করে। রাজার ছেলে বল্কল ধারণ করিয়া বনের ফলমূল আহার করিয়া একাদিক্রমে দ্বাদশ বর্ষ সুপ্তি-

বিবর্জ্জিতনেত্রে জাগ্রত প্রহরীর কাজ করিতে এই ভারতেই দেখিবে। মানবের জরা মরণ শোকের প্রতিকারোপায় সন্ধানে রাজার নন্দন রাজ-ঐশ্বর্য্য, প্রিয়তমা পত্নী, ফুল্লকুসুমতুল্য অপত্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে এই ভারতই পারে।

আমার মনে হইয়াছিল, নেতাজী-শূন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া নেতাজীর বীর সহচরের আকুল ক্রন্দনের ইহাই কারণ। ভারতীয় জাতীয় বাহিনী একদিন কায়মনে কামনা করিয়াছিল, তাহাদের নেতাজীকে তাহারা এই কক্ষে পরিপূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত দেখিবে; প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল বলিয়াই না ঐ কক্ষ শূন্য—গৃহ অন্ধকার! ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? তাহারা মনে করে, শা নওয়াজ খান মনে করেন, তাহারাই দায়ী—তিনিই দায়ী; তাই সেই কাকুতি, —I have failed. নেতাজি, I have failed.

আমার প্রবন্ধনিচয়ের পাঠিকা এবং পাঠকগণের স্মরণ আছে যে, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং দেশে থাকিতে, কংগ্রেসের সহিত ফরওয়ার্ড ব্লকের (তাঁহারও) সম্পর্কটা কাটারী ও কুষ্মাণ্ড, আদ্রক ও নীল রম্ভার মত হইয়া উঠিয়াছিল। পঠদ্দশায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ্য, ওটেন-নাট্যের নায়ককে রাষ্টিকেট্ করিয়াছিলেন, রাজনীতি ক্ষেত্রেও, কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে রাষ্টিকেটেড্ হইতে হইয়াছিল, তখনকার দিনের কথা যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিতেন, গুরু শিষ্য মিলনের আশা সুদূর পরাহত; আদৌ আশা ছিল কি না তাহাতেও দারুণ সন্দেহ ছিল। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভীষ্মদ্রোণ বধের দশা হইলেও হইতে পারিত।

পুরাণের কথাটা যখন উঠিল, তখন পৌরাণিক আখ্যার আলোচনা একটু করি না কেন! ধনঞ্জয় যুদ্ধ করেন ভাল; রণদুর্ম্মদ এবং অপরাজেয় কিন্তু ভীষ্মের সম্মুখীন হইবামাত্র সব্যসাচীর করধৃত শরাশনও

কাঁপিতে থাকে; সব্যসাচীর হাত অবশ অবাধ্য হয়; অর্জ্জুন মৃদু যুদ্ধ করেন। ভয়, পাছে পিতামহকে আঘাত করিতে হয়। পাণ্ডব পক্ষের এই অভিযোগ, অর্জ্জুন অর্জ্জুনোচিত যুদ্ধ করেন না; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও সেই অনুযোগ। আর সেই জন্যই গীতার সৃষ্টি। বেদবেদাঙ্গ অভিজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিদ সর্ব্বকৃৎ নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ-অধ্যায় গীতা 'সালিলকি' করিয়াছিলেন তাহা আমি একবারও মনে করি না; আবার ইহাও মনে করি না যে, সংস্কৃতজ্ঞ কোন 'ষ্টিনো' বা প্রেস-রিপোর্টার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া গীতাটা টুকিয়া লইয়াছিল। তবে গীতা বিশ্বাস করি।

বিশ্বাস করি যে, গীতার সৃষ্টি এই সময়েই হইয়াছিল। আরও বিশ্বাস করি, কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে যে শিক্ষা যে আদর্শের পানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৃথিবীর নির্ম্মনুষ্য হইবার পূর্ব্বক্ষণে মানুষকে সেই কথা বলিবার এই সময়! গীতার সৃষ্টি যদি হইয়াই থাকে, আমি মনে করি, হইয়াছে, তবে তাহার এই সময়; এই সময়েই গীতা জন্ম লভিয়াছে।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীও, এই দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়াখণ্ডে, এই সময়ে ভারতীয় কংগ্রেসের বাণী শুনিয়াছিল। মালয়ে, ব্যাঙ্ককে, শোনানে ফরওয়ার্ড ব্লকের কথা নহে, ত্রিপুরীর কলঙ্ক কাহিনী নহে, কংগ্রেসের কথাই তাহারা শুনিয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রের নরমেধযজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানুষ একদিন সবিস্ময়ে শুনিয়াছিল, অহিংসা পরম ধর্ম্ম!

বহু সহস্র, বহু শতাব্দী পরে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দিল্লী অভিযাত্রী অতি বিস্ময়ে শুনিল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংসাই একমাত্র অস্ত্র।

এমন অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য বিধান কিরূপে হয় ?

শা নওয়াজ খান সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তাঁহার নেতাজীর 'অর্ডার অফ দি ডে' সামঞ্জস্যের সন্ধান দিয়াছে।

ভারতের বাহিরে, প্রয়োজন হইলে অস্ত্র ধারণ সম্ভব হইতেও পারে ; ভারতের অভ্যন্তরে, ভারতের মাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র, ভারতবাসী নিরস্ত্র ; অহিংস যুদ্ধের অহিংস সৈনিক।

তাই, আজাদী মেজর জেনেরাল শা নওয়াজ খান কংগ্রেসের দীন সেবক।
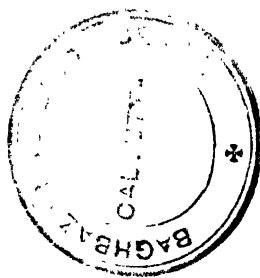
নবম স্তর—নারী-সঙ্ঘ

পঞ্চ-নদীর সংযোগ-স্থল পাঞ্জাবকে যোদ্ধার দেশ ও 'পঞ্চ নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে' যে মানুষ বসতি করে তাহাকে যোদ্ধার জাতি বলা হয়। এই আখ্যা আদৌ অসঙ্গত নহে; বরং বর্ণে বর্ণে, ও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পাঞ্জাব প্রদেশের মানুষের শরীর ও শরীরের গঠন, দীর্ঘোন্নত দেহ, সুপুষ্ট ও সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সাহস, শৌর্য্য, কষ্ট-সহিষ্ণুতা সমস্তই তাহার আখ্যার অনুকূল। শুধু পুরুষেরই নহে, পঞ্চনদের তীরনিবাসিনী প্রকৃতি সুন্দরী তাঁহার দুহিতৃগণকেও স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, সাহসে ও সুগঠিত দেহে সুসমৃদ্ধ করিয়া তাহাদিগকেও সিংহের যোগ্য সিংহিনী করিয়াছেন। ডাল-হাউসীতে, সেদিন সকালে, আমরা যখন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, এক দল পাঞ্জাবী কোমলাঙ্গীর একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আমরা পথের ধারে দাঁড়াইয়া, পথ ছাড়িয়া দিলাম। শোভাযাত্রা বাজারের দিকে গেল, সুভাষচন্দ্র ও আমি বাসার দিকে ফিরিলাম। মনে হইল, পাঞ্জাবী তরুণীরা গার্ল গাইড অথবা ঐ রকম কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল মহাজন, কবি কিম্বা রসিক ব্যক্তি নারীর বিশেষ্য-বিশেষণে কোমলাঙ্গী শব্দটির বিধান দিয়াছেন, তাঁহারা বোধ করি পঞ্চনদের তটভূমি দর্শন করেন নাই। কোমলাঙ্গীর ছড়াছড়ি, হুড়াহুড়ি, হুলাহুলি আমার বঙ্গদেশে।

"কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলে
দল্‌তে হয় রে দুর্ব্বা কোমল?"

—উত্তর, বঙ্গদেশ। তেমনই যদি প্রশ্ন করা যায় যে, কোন্

দেশে কোমল শব্দের অর্থ, ভঙ্গুর ? 'বোধ করি' উত্তরে বঙ্গদেশের নামই শুনিতে হইবে। 'বোধ করি' কথাটা বিনয়বশতঃ ব্যবহার করিলাম। বিনয় বড় সদগুণ; একটু বিনয় থাকা ভাল। কিন্তু আশা করি অপ্রিয় সত্য ভাষণে আমার স্নেহশালিনী পাঠিকা-সমাজ ক্ষুণ্ন হইবেন না। আমি শুদ্ধমাত্র দর্পণ ধারণ করিয়াছি। পাঞ্জাবের কোমলাঙ্গী-শোভাযাত্রা যখন চলিয়া গেল, মনে হইল (অন্ততঃ আমার মনে হইল), এক দল 'ম্যানোয়ারি' গোরা বিপক্ষের কেল্লা অভিযানে গেল।

সুভাষচন্দ্র প্রসন্ন নয়নে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, আমাদের কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবিকারা তৈরী হয়েছে বটে কিন্তু এমন স্বচ্ছন্দ (free) ও সাবলীল এখনও হতে পারে নি। আমার কংগ্রেস হাউসের নারী-বাহিনীকে আমি চেষ্টা করবো ঠিক এই রকম ক'রে গড়তে। এক মুহূর্ত্ত থামিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, আবার বলিলেন, বছর পাঁচেক আগেও দেখা যেতো, মেয়েরা যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ছে; বেশ মাথা উঁচু, সোজা চোখ ক'রে চল্‌ছে—চল্‌ছে, হঠাৎ একজনের মনে একটু লজ্জা এসে পড়লো, হয়ত কোনও চেনা লোকের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেছে কিম্বা ঐ ধরণের একটা কিছু হলো, অমনি সঙ্গে সঙ্গে নারীর চিরভূষণ লজ্জা এসে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে তাল ভাঙ্গলো, বেখাপ্পা পা পড়ে গেলো, আর এক মুহূর্ত্ত মধ্যে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়ে সমস্ত জিনিষটাই বিশৃঙ্খল হয়ে গেলো, সামঞ্জস্য (harmony) নষ্ট। এখন এতখানি খারাপ যদিচ হয় না, তবু, মনে হয়, নিখুঁত হতে আরও কিছু সময় লাগবে। ক্ষিতীশ চাটুর্য্যেকে বলেছি, কর্পোরেশনের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে (Rally) ছাত্রীদের দিকে যেন বেশী মনোযোগ দেয়। জানেন দাদা, আমাকে সবাই নারীর দিকে বেশী পক্ষপাতিত্বের দোষে দোষী করে ?

আমি হাসিলাম : এ কথার উত্তর অন্য সময়ে দিতে হইয়াছে; সে কথা সেই সময়ে বলিব।

এখন কথা বলিয়া তাঁহার পরিকল্পনার প্রকাশের গতি ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা আমার হইল না; নীরবে পথ চলিতে লাগিলাম। সুভাষ কহিতে লাগিলেন, আমার কংগ্রেস হাউসের এক লক্ষ জাতীয় সৈন্যের মধ্যে অন্ততঃ দশ হাজার করতে হবে নারী সৈন্য। অবশ্য এর মুস্কিলও আছে। আমাদের দেশের বাপ-মায়েরা অত্যন্ত রক্ষণশীল (conservative), বিষম গোঁড়া; ভারি ভয়—মেয়েরা নষ্ট হয়ে যাবে; বয়ে যাবে। কিন্তু ক্রমশঃ, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাঁদের হাল ছেড়ে দিতে হচ্ছে। ছেলে মেয়েদের সায়েস্তা করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, ফল ভাল না হয়ে খারাপ হয়। তাঁরা জোর করতে গেলে, এরা বেশী অবাধ্য হয়ে ওঠে। কলকাতা কংগ্রেস একজিবিশনে দেখেছিলেন ত, ঢের মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা হয়েছিল; সে প্রায় দশ বছর আগের কথা; এখন সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দিক থেকে (from our point of view) অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। সেই জন্যেই মনে হচ্ছে, দশ হাজার নারী সৈন্য অনায়াসেই পেয়ে যাবো।

রঙ্গ ভরেই প্রশ্ন করিলাম, মোটে দশ হাজার?

সুভাষ কৃত্রিম কোপসহকারে কহিলেন, রহস্য হচ্ছে বুঝি?

রহস্য ব'লে মনে হবার কি কারণ ঘটলো বলুন তো?

ভুলবেন না দাদা, সেটা বাঙ্গলা দেশ। কোন্ বাপ-মা না তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে না চাইবেন? আপনি পারবেন—আপনার মেয়েদের বিয়ে না দিয়ে—ওহ্ আপনার ত ও পাটই নেই—দায় নেই (no liability) আপনার সমস্তই লাভ (all assets) তিনটিই ছেলে—ভাগ্যবান লোক।

আমি কহিলাম—সন্ন্যাসী উদাসী লোক, সংসারীর ভাগ্য অভাগ্য বিচার করতে পারে না কি ?

সুভাষ ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে কহিলেন, পারে বৈ কি! সে যাক্, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর নারী শাখা ভাল ভাবেই গড়বো এতে সন্দেহমাত্র নেই।

সে সন্দেহ আমারও ছিল না। কলিকাতা সহরে, পরিকল্পিত কংগ্রেস ভবনটি গঠিত হইবার সুযোগ হয় নাই; নানা বিপাকে ও দুর্ব্বিপাকে তাহার অস্থি ও পঞ্জরের উপরে মেদ ও মাংসের সঞ্চার আজও হইল না, সত্য; কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁহার কল্পনার চিত্রখানিতে, মানসের প্রতিমাখানিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ঝাঁসীর রাণী ব্রিগেডের কাহিনী আজ কাহার অজ্ঞাত আছে? কে না জানে, কে না শুনিয়াছে যে, সুদূর-বিস্তৃত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডে বহুধা বিক্ষিপ্ত শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতীয় নারী স্নেহস্নিগ্ধ, প্রেম-পবিত্র সুমধুর, সুমহান ভারতের জয়ধ্বনিতে একত্রিত, এক তারে বাঁধা, এক সূত্রে গাঁথা এক-নারীসঙ্ঘে রূপায়িত হইয়া অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত, চর্ম্মে বর্ম্মে অলঙ্কৃত, শৌর্য্যে বীর্য্যে বিমণ্ডিত হইয়া পুরুষের সঙ্গে, পৌরুষ সহকারে দুর্ম্মদ দুরন্ত রণরঙ্গে মাতিয়াছিল? পুরুষের সহিত সমান দুঃখ, সমান কাঠিন্য, সমান ক্লেশ, সমান কৃচ্ছ্র-কঠোরতা, সমান লাঞ্ছনা—সমান হাসিমুখে বরণ করিয়া ভারত-নারী সম্পর্কে সদাপ্রযোজ্য 'আহা অবলা' অভিধানের বিলোপ সাধন করিয়াছিল এ কথা আজ কি কাহারও অবিদিত আছে? এ দেশের নারী 'দশ হাত কাপড়ে উলঙ্গ', 'এ দেশের রমণী ফুলের আঘাতে মূর্চ্ছা যাইতে অভ্যস্ত', 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা', 'এ দেশের মেয়ে লিভিং লগেজ'—কত কথাই ত কত কাল ধরিয়া শুনা গিয়াছে। কিন্তু সুভাষ যখন পরাধীন ভারতের পরাধীনতার পাপ পাশ-বিমোচনজন্য এসিয়া খণ্ডের কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া

নবীন গীতা রচনায় উদ্যোগী হইলেন, তখন ভারতের এই যুগ-যুগনিন্দিত নারী স্ফীত উন্নত বক্ষে, সাহসপ্রোজ্জ্বল নয়নে নেতাজি-সকাশে উপনীত হইয়া তির্য্যক কণ্ঠে কহিল, আমরা কি অপরাধ করিয়াছি? ভারতবর্ষ কি আমাদের মাতৃভূমি নহে? আমরা কি দুঃখিনী জননীর কন্যা নহি? হে বিপ্লবী হে বীর, আমাদের হাতে অস্ত্র দিন, আমাদের উপরে কার্য্যের ভার দিন; বিপ্লব সুসম্পূর্ণ করুন।

বীর বীরের মর্য্যাদা বুঝে। বীরহৃদয় সুভাষচন্দ্র বীরাঙ্গনা-হৃদয় নখদর্পণে দেখিতে পাইলেন। তদ্দণ্ডে প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ঝান্সীর রাণী বাহিনী গঠিত হইতে বিলম্ব হইল না।

সারা জীবন সুভাষচন্দ্র বিপ্লব সাধনা করিয়াছেন। মাত্র রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটাইয়াই তুষ্ট থাকিবার লোক তিনি নহেন; সামাজিক বিপ্লব না আনাইতে পারিলে, স্বাধীনতাও পল্কা ভিত্তির উপরে গঠিত প্রাসাদের মত ভঙ্গুর হইতে বাধ্য। এই সত্য সুভাষচন্দ্র না জানিবেন ত কে জানিবে? সারাজীবন বিপ্লব সাধনা করিয়া যিনি বিপ্লবসিদ্ধ হইতে চলিয়াছেন, এই শাশ্বত সত্য অস্বীকার তিনি কেমন করিয়া করিবেন? সংস্কারের বিরুদ্ধে, প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে, সনাতনী নীতির বিরুদ্ধে, লোকাচারের বিরুদ্ধে প্রতি পদবিক্ষেপে বিদ্রোহ করিয়া যিনি বিপ্লবের সেরা বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যত, তিনি জনসমাজের অর্দ্ধাংশকে অবজ্ঞা অথবা উপেক্ষা করিলে, তাঁহার বিপ্লব-দর্শনই ভুয়া হইয়া যাইত। সুভাষ কখনই সে ভুল করিতে পারেন না।

ডালহাউসী-প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমি অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি কিন্তু অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মনে করি না। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ এই লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্কানুসারী। বঙ্কিমপদ্ধতিতে লেখক দুর্ভেদ্য ও দুরধিগম্য স্থানেও গমনক্ষম। তাই

আমি এক্ষণে ভারতবর্ষের বাহিরে, বহুদূর—সুদূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় যাত্রা করিতেছি। বৃটিশ—যে বৃটিশ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, যাহার সাম্রাজ্যমধ্যে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না, মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের উপরেও যে ব্রিটানিয়ার শাসন অপ্রতিহত ও অব্যাহত, কালহি বলবত্তরঃ সেই বৃটিশ লজ্জা ঘৃণার মাথা খাইয়া, নবারুণরাগরঞ্জিত জাপানের ভয়ে ত্যক্ত পেণ্টুলুনে, শ্বেতপ্রাণগুলিকে করতলপুটে আবদ্ধ করিয়া কোথায়, কোন্ চুলায় পলায়ন করিয়াছে—কোথায় রাজ্য, কোথায় সাম্রাজ্য, কোথায় দম্ভ, কোথায় দর্প, শার্দ্দুলাশঙ্কায় শৃগালের মত পশ্চাদপদদ্বয়ে নিবদ্ধলাঙ্গুলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! বর্ব্বর জাপান লালসা-সম্প্রসারিত করে বৃটিশ পরিত্যক্ত রাজ্য, ধন, সম্পদ্, প্রাণ লুণ্ঠনোদ্যত! যখন এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে শাসনের চেয়ে অশাসনের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলার তাণ্ডব নর্ত্তন, মানুষের জীবনের আশা সন্ধ্যারবির মত দিগন্তরালে অস্তমিত, আতঙ্কে, আশঙ্কায়, অনিশ্চয়তায় বেতসপত্রের মত কম্পান্বিত, যখন সর্ব্বস্বের বিনিময়েও প্রাণটুকু রক্ষা পাইলে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সেই সময়ে সেই ভূখণ্ডের নারী নেতাজীর নিকট নিবেদন করিতেছে, তীর্থযাত্রায় আমাদের সহযাত্রী করো!

যিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচি মেয়েদেরও অবহেলা করেন নাই, তিনি—সেই বীর সাধক বীর-নারীর আকুল আবেদন উপেক্ষা করিতে পারেন না। নেতৃত্বের জন্য যাঁহাদের সৃষ্টি, সে ধাতুতে তাঁহাদের গঠন হয় না।

তীর্থযাত্রা? তাই বটে! তীর্থযাত্রাই বটে। মৃত্যুর চেয়ে বড় তীর্থ, পবিত্র তীর্থ আর আছে না কি? বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে

ঢুকিলে ক্ষণেকের তরে জ্বালার উপশম, অশান্তির শান্তি হয়, জানি ; পুরুষোত্তমের সম্মুখে দাঁড়াইলে শোক তাপ দুঃখ গ্লানি তখনকার মত নিবারিত হয়, তাহাও মানি ; প্রাণ শীতল হয়, হৃদয় জুড়ায়, তাহাও স্বীকার করি কিন্তু কয় দণ্ড ? কয় মুহূর্ত্ত ? সংসার, রোগ, শোক, দুঃখ, অভাব, দৈন্য, হিংসাদ্বেষ, কলহবিবাদ মন্দিরের পথে ভিখারীর মত, রাজপথে পুলিশ প্রহরীর মত, কারাগারের দ্বারে শান্ত্রীর মত সারি দিয়া, কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! ছার সংসারী মানবের কি সাধ্য যে অতিক্রম করিয়া যায় ? আর মৃত্যু ? জ্বালার চির অবসান ; সন্তাপের চির বিলোপ ; অশান্তির নিঃশেষ শেষ ! 'মরণ রে তুঁহু মোর শ্যাম সমান।' আর সেই মৃত্যু যদি দেশের জন্য, জন্মভূমির জন্য, মাতৃভূমির জন্য, দেশের আহ্বানে, জন্মভূমির আমন্ত্রণে, মাতৃভূমির উদ্দেশে যায়, সে কি মহাতীর্থযাত্রা নহে ? সেই মহাতীর্থযাত্রায় পুরুষ চলিয়াছে, সে মহাতীর্থ-যাত্রায় নারীর অধিকার নাই ? স্বতঃ অভিমানিনী নারী এই অনাদর—এই হতাদর সহ্য করিবে ? তীর্থযাত্রায় নারী সকলের আগে পুটলী বাঁধে ! চিরদিন বাঁধিয়াছে, আজও বাঁধিবে ! কাহার সাধ্য বাধা দেয় ?

সুভাষচন্দ্র অকৃতদার। আকুমার ব্রহ্মচারী বলিয়া একটা সাধু ভাষা চলিত আছে। সুভাষচন্দ্র সেই আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারেন কি না তাহা লইয়া শিরোবেদনা ঘটাইবার আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি যে, একটি ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে দারাসুত লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার উপকরণের নিদারুণ অভাবই তাহাতে পরিলক্ষিত হইত। পত্নীপ্রেম, অপত্য স্নেহ কামনার বস্তু সন্দেহ নাই—তুমি আমি, আপনারা তাহারা প্রশান্ত, সুশান্ত বসন্ত লইয়া আমরণ সুখবিব্রত থাকিতেই চাই তাহাও ঠিক, কিন্তু যে উদ্দাম প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজনীন

প্রবৃত্তির সহিত সত্বা সংস্থাপিত করিতে জন্ম লভিয়াছে, তাহার পক্ষে ক্ষুদ্র গণ্ডীর কল্পনাও সহনাতীত। দুই যুগাধিক কালপূর্ব্বে, পূর্ণ থিয়েটারে "বঙ্গবালা" চিত্র-উদ্বোধনে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, যে কথা শুনিয়াছিলাম (গ্রন্থারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে) নারী-জাতির প্রতি যে মমত্ব, দৃপ্ত মর্য্যাদাবোধের পরিচয় প্রদীপ্ত হইয়াছিল, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়াখণ্ডে ভারতীয় অবলার কোমল করকমলে খর্পর প্রদান—তাহারই পূর্ণাহুতি !

সুভাষচন্দ্র যে অক্ষম করে তরবারি অর্পণ করেন নাই এবং যে দানবদলনী বীর নারীর নামে তাঁহার প্রমীলা সৈন্যবাহিনীর নামকরণ করিয়াছিলেন, সেই নারীরা সেই মহিয়সী নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, ভারতীয় নারীর গৌরব বৃদ্ধি করতঃ ইতিহাসের পৃষ্ঠা সুবর্ণপ্রভায় প্রভাসিত করিয়াছেন, বহুদূর সুদূরে থাকিয়াও আমরা তাহা জানিতে পারিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। সদ্যঃমুক্তিপ্রাপ্ত জাতীয় বাহিনীর সৈনিকপ্রদত্ত বিবরণ বারান্তরে শুনাইবার ইচ্ছা রহিল। সুভাষ-গঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে ধর্ম্মবর্ণসম্প্রদায়গত বিভেদবিমুক্ত ও পঙ্কিলতাবর্জ্জিত করিতে পারিয়া সুভাষচন্দ্র যে অশ্রুতপূর্ব্ব অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন যে কীর্ত্তিস্তম্ভের পানে বিস্ময় বিমোহিত ভারতবাসী স্তব্ধহৃদয়ে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে ইহাও যেমন প্রত্যক্ষীভূত সত্য, অবলা ভারতবালাকে বীরনারীর ভূষণে বিভূষিত করিয়া নারীত্বের মর্য্যাদার মহোচ্চশিরে যশোমুকুটবিশোভিত করিয়া যে অপরিসীম দুঃসাহসিকতার পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বীরহৃদয়ের পরিপূর্ণ আলেখ্যতলে ভারত-নারীর শ্রদ্ধার্ঘ্য যুগযুগান্তকাল পর্য্যন্ত উৎসর্গীকৃত হইতে থাকিবে, ইহাও তেমনই অবিসম্বাদিত সত্য ! আমার এই উক্তি সমস্ত নারীর অন্তরেই প্রতিধ্বনি ধ্বনিত করিবে, ইহাই আমার অন্তরের অনুভূতি।

আমার উক্তির সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছি, ২৩এ জানুয়ারী ১৯৪৬,

সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি উৎসবে। বৃটিশের মহাসাম্রাজ্যের মধ্যমণি কলিকাতা মহানগরীতে বৃটিশের লাট, বৃটিশের কেল্লা, বৃটিশের কামান, বন্দুক, গোলাগুলি, বারুদ, বৃটিশের ট্যাঙ্ক, বোমারু, বম্বার, বিমান, লাল কাল শ্বেত নীল সৈন্যসামন্ত, অপ্রতিহতপ্রতাপ পুলিশ-সুরক্ষিত কলিকাতায় এমন একখানি গৃহ ছিল না, যে গৃহশিরে না ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা না উড্ডীন হইয়াছিল! এমন একখানি গৃহ ছিল না সন্ধ্যায় যাহার অলিন্দ আলোকমালায় বিভূষিত না হইয়াছে! ভূমিকম্পে পৃথিবী ধ্বংসকবলিত হইতে চাহিলেও এত শঙ্খনিনাদ হয় কি না বলা কঠিন যত শঙ্খ সেইদিন দীপ্ত মধ্যাহ্নে নারীর মুখে মুখে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। পুরুষ তখন কোথায়?—আফিসে গিয়াছে, আদালতে গিয়াছে, খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছে। পুরনারী—পুরবালা পতাকা উড্ডীন করিয়াছে; শঙ্খধ্বনি করিয়া পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বেকার একটি শুভক্ষণকে অভিনন্দিত করিয়াছে; মঙ্গলকরে প্রদীপ সজ্জিত করিয়াছে। বাল্যকালে, জন্মাষ্টমী নিশীথে, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে 'জন্মাষ্টমী' নাটকাভিনয় দেখিয়া যে পুলক প্রবাহে স্নান করিতাম, আজ এ জীবন অপরাহ্নে, ২৩এ জানুয়ারী সুভাষ-ষষ্ঠিতে সেই পুলকের প্লাবন প্রবাহিত হইতে দেখিলাম। মুঘলের 'খুসরোজ' মনে পড়িল! মনে হইল—আহা! কি দেখিলাম! আর কি এমন দেখিব!

বিলাসে বসনে, বিদেশীর অনুকরণে, বিজাতীয় আচরণের প্রভাবে ভারতীয় নারী যেন আপনার স্বত্বা, আপনার মর্য্যাদা, আপন অধিকার ভুলিতে বসিয়াছিলেন, আজ অনেককাল পরে, এক মহাভাগ্যবান, মহামানবের জন্মলগনে বিস্মৃতির অতল তল হইতে লুপ্ত রত্নোদ্ধার হইয়া গেল। নারী সেদিন পুরনারী হইয়া আপনার হাতে পূজার ডালা সাজাইয়াছে, চন্দনপিঁড়িতে চন্দন ঘসিয়াছে, তুলসীমূলে প্রদীপের মালা গাঁথিয়াছে। মাঘের সেই বিগতশীত মলিনধূসর অলস শান্ত দিবস ও সন্ধ্যা, সুভাষের আজাদ হিন্দের সুরভিত-বসন্তমলয়ানিলান্দোলনে

নিখিল ভারতবর্ষের অঙ্গে যে শিহরণ, ভাষার নিক্তিতে তাহার পরিমাণ করিতে চেষ্টা করাও ধৃষ্টতা মাত্র।

২৩এ জানুয়ারীর এই অভিনব দৃশ্য:বৃটিশ দেখিয়াছে পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যবৃন্দও দেখিয়াছে, আমেরিকাও চাক্ষুষ করিয়াছে, হয়ত বা বিজয়ী মিত্রপক্ষীয় অন্য দেশের লোকও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ভারতের তমসাচ্ছন্ন আকাশের পূর্ব্বদিকচক্রবালে উষার আলোকচ্ছটার যে জ্যোতিরুৎসবের সূচনা করিতেছে, তাহাকে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করিবার মত উদারতা কি তাহাদের আছে? অস্ত্র নাই—নিরস্ত্র, হিংসাদ্বেষঅসূয়াবিবর্জ্জিত আনন্দপরিপ্লুত জয় হিন্দ ও বন্দে মাতরম্ ধ্বনি কি সাম্রাজ্যবাদীর কর্ণে কামানের গর্জ্জন বলিয়া অনুভূত হইতেছে না? জানি না, জানিতে চাহি না। আমার সাড়ে তিন বৎসর বয়সের নাতনী রত্না মজুমদার অলিন্দে অলিন্দে প্রদীপের পলিতা উস্কাইয়া দিতেছে আর আপনার মনে আপনি বলিতেছে, জয় হিন্দ! জয় হিন্দ! একটি প্রদীপও সে নিবিতে দিবে না; নির্ব্বাণ-প্রায় দীপে স্বহস্তে তৈল দান করিতেছে; দশটি অতি ক্ষুদ্র, অতি কোমল, অতীব পেলব চাঁপার কলির আড়াল তুলিয়া অবাধ্য বাতাসকে প্রত্যাহৃত করিতেছে; আর বলিতেছে, জয় হিন্দ!

সুভাষ জন্ম তিথি পালন করিয়া জাতি ধন্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই কিন্তু আমার বড় আশা ছিল, ঐ পুণ্য দিবসে সুভাষ-পরিকল্পিত মহাজাতি সদনের অসম্পূর্ণতা বিলোপের সঙ্কল্পও গৃহীত হইবে। ভারতবর্ষে—কলিকাতায়, সুভাষের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র, কলিকাতায় তাঁহার শেষ আরব্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, যে দেশে সুভাষচন্দ্রের জন্ম, যে জাতির মধ্যে তাঁহার অভ্যুদয়, আমরা সেই দেশের সেই জাতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব। আইনের বাধা থাকে, থাক্; অর্থাভাব থাকে, থাক্! যে দেশের, যে জাতির অন্তরের অন্তরে সুভাষচন্দ্র দাবাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশ ও সেই জাতির সম্মিলিত বাসনার

বাষ্পমাত্রেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন বাত্যাবিতাড়িত তৃণ খণ্ডের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। অর্থাভাব? পথিক, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরিয়া পথ চলিবার সময় মহাজাতি সদনের কঙ্কাল দেখিয়া কি তোমার মনে লজ্জার উদয় হয় না? চল্লিশ লক্ষ নর-নারীর কলিকাতা মহাজাতি সদন-দ্বারে একটি বার, মাত্র একটি টাকা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া যাইতে সত্যই ক্লেশ বোধ করিবে? সুভাষচন্দ্রের শেষ-অবদানের মর্য্যাদার প্রতি আমাদের মমত্ব কি এতই অসার, এতই ভঙ্গুর? কি জানি; কেন জানি না, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইচ্ছা করে, অন্তরের সমস্ত আকুলতা, হৃদয়ের শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নেহ-প্রেম ব্যাকুলতা আমার এই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল কণ্ঠ-নিম্নে একত্রিত করিয়া বলি—

দাঁড়াও পথিকবর

জন্ম যদি তব বঙ্গে—

—মহাজাতি সদনের সম্মুখে মুহূর্ত্তের তরে দাঁড়াও; পলকের জন্য চিন্তা করো, স্বদেশে, সুভাষচন্দ্রের এই ছিল শেষ বাসনা! শেষ অভিলাষ!

বন্দে মাতরম্।

জয় হিন্দ।

একদা সমস্যা ছিল, পরাধীন জাতির লোক রাজনীতির চর্চ্চা করিবে কিম্বা করিবে না।

নানা মুনির নানা মত শুনা গিয়াছিল।

পরাধীন জাতির লোকের পক্ষে রাজনীতি ব্যতিরেকে অন্য নীতি নাই। আজ এই মতই স্বীকৃত হইয়াছে।

একদিন আরও এক সমস্যার উদ্ভব হইল, ছেলে-মেয়েরা রাজনীতি চর্চ্চা করিবে কি না।

ইহাতেও দেখা গেল বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ী। অধিকাংশের মতে ছেলে-মেয়েরা রাজনীতি হইতে দূরে থাকিলেই মঙ্গল। ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকগণ তাহাই চাহেন। কিন্তু বাস্তবে তাহা সম্ভব হয় নাই। শুধু আজ বলিয়া নয়, স্মরণাতীত কাল হইতে, কিম্বা যে দূর অতীতে আমাদের দুর্ব্বল স্মরণ শক্তি পৌঁছিতে পারে, সেখানেও দেখিতেছি, রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্ত্তে ছেলেদের রেহাই দেওয়া হয় নাই। মেয়ের সংখ্যা সেকালে নগণ্য ছিল।

১৯০৫ হইতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাত। ইহার পূর্ব্বেও কয়েকটি আন্দোলন আমাদের এই বাঙ্গলা দেশেও পরিচালিত হইয়াছে বটে; কতকগুলির সাফল্যমণ্ডিত পরিণতির ইতিবৃত্তও আমরা অবগত আছি কিন্তু সেগুলির সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিতে পারিব না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রয়োজনীয় ইতিহাসটুকুও অতি কষ্টে স্মরণ করিতে পারা যায়। স্মরণ শক্তির অপরাধ নাই। কারণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে পদাতিক

বাহিনী ও পতাকাবাহিদিগের মধ্যেই বর্ত্তমান লেখকের স্থান ছিল। সেকালে এই পদাতিকবাহিনী মূলতঃ বালক লইয়াই গঠিত হইত; দেখিতেছি আজও তাহাই হইয়া থাকে। ইহারা পতাকা বহন করে এবং গলার শির ফুলাইয়া শ্লোগান্ ধ্বনিত করিতে থাকে।

সেকালেও এই ব্যবস্থা, একালেও তাহাই। সুতরাং ছেলেরা রাজনীতি করিবে কি-না এই অনাবশ্যক প্রশ্ন প্রশ্নহিসাবে দেশের সম্মুখে বহুকাল ধরিয়া আছে বটে; ইহার সদুত্তর কেহই দিতে পারেন নাই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি মনস্বীগণ বালক বাহিনীর উপরে যে কতটা নির্ভর করিতেন তাহা বলিবার নহে। ছেলেরাও যে 'সর্ব্বকর্ম্ম' পরিহরি নেতৃবৃন্দের খিদমত খাটিয়াই দিন এবং রাত কাটাইয়া দিত তাহাতেও সন্দেহ নাই।

আজকাল নেতৃবৃন্দ মোটরে চলাফেরা করিয়া থাকেন, তখনকার দিনে মোটর গাড়ী ছিল না; ঘোড়ার গাড়ী—অবশ্য ভাল ভাল জুড়ি গাড়ী নেতৃবৃন্দের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। ঘোড়ার বদলে ছেলেরাই গাড়ী টানিত। তখনকার দিনের বীর পূজার ঐ একটি দৃষ্টান্তই দিলাম। গোলদীঘি হইতে পার্শিবাগান, বাগবাজার হইতে 'বেঙ্গলী' আফিস নেতৃবৃন্দ সমাসীন ল্যাণ্ডো গাড়ী ছেলেরা যে কত দিন জগন্নাথের রথ টানা করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। নেতৃবৃন্দ যে অখুসী ছিলেন একদিনের জন্য তাহাও মনে হয় নাই।

পরবর্ত্তী কালে গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন ও তাহার ক্রোড়াঙ্ক হিসাবে দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টি পরিচালিত কাউন্সিল-এসেম্বলী প্রবেশ সম্পর্কিত আন্দোলনে ছেলেরা যখন আগের মত সমান তেজে, সমান নিষ্ঠার সহিত, হয়ত বা অধিকতর সংখ্যায় কাজ করিতেছে, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নেতৃবৃন্দ—যাঁহাদের গাড়ী আমরা টানিয়াছি, যাঁহাদের মস্তকে ছত্র আমরাই ধরিয়াছি,

গলায় যাঁহাদের মালা আমরাই দিয়াছি, একটি মুহূর্ত্তের জন্য অসন্তুষ্ট হন নাই, আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এক তিল আড়ষ্টও হন্ নাই, তাঁহারাই এক্ষণে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ছেলেগুলো গোল্লায় গেলো!

এই অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছিল।

যুগে যুগে রাজনীতি যে ছেলেদের উপরে অনেকখানি নির্ভর করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এক কাল ছিল যখন নেতারা ছেলেদের সহায়তা লাভ করিয়া ধন্য হইতেন আবার সময় বিশেষে ছেলেদের মাথা খাওয়া হইতেছে ভাবিয়া খেদ প্রকাশও করিতেন। অসহযোগ ও তৎপরবর্ত্তী আন্দোলন কালে পরস্পর বিরোধী ভাবের সংঘর্ষের অবসান হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত কার্য্য-সূচির মধ্যে একটি বোধ করি এই ছিল, ইংরাজ প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির অবসান ঘটাইতে হইবে; গোলামখানা বন্ধ করিতে হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষে গোলামখানা ভাঙ্গিবার সে কি ধুম পড়িয়া গেল। দেশে তখন পদ্মা নদীর বান আসিয়াছে—নগর গ্রাম প্রান্তর সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে; ঘর বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িতেছে।

বাঙ্গলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় গান্ধীজীর সৈন্যাধ্যক্ষ। গোলামখানা টলমল্ করিতেছে; স্কুল কলেজের অস্তিত্ব লইয়া টানা হেঁচড়া পড়িয়া গিয়াছে; ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার দুই বিরাট, দুই শক্তিধর, দুই অমিতপ্রভাব কর্ম্মবীর বর্ষাপ্লাবিত নদীর দুই কূলে দাঁড়াইয়াছেন। বাঙ্গলার বহু ভাগ্য যে একই সময়ে বঙ্গভূমিতে তুল্য শক্তিমান দুইজন মনঃস্বীর উদ্ভব হইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জন দাশ ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বাঙ্গলার এই দুই

সুসন্তান নদীর দুই তীরে দণ্ডায়মান। অসহযোগ-আন্দোলন-আবর্ত্তিত নদী উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া মধ্যস্থলে প্রবাহিত হইতেছে।

গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য চিত্তরঞ্জন মহারুদ্রের সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সৃষ্টি রসাতলে পাঠাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। আর আশুতোষ. স্বয়ং রুদ্র হইয়াও বিষ্ণুর মত সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে যত্নবান। একজন সংহার সংহার রবে ধাবমান; অপরজন সম্বর সম্বর করিয়া ব্যাকুল বঙ্গবাসীকে অভয় দিতেছেন। এই পরস্পর বিরোধী ভাব সজ্বর্ষ ভাবপ্রবণ বঙ্গদেশে কি ভীষণ আলোড়ন যে আনিয়াছিল, তাহার সম্যক পরিচয় দিবার শক্তি সামর্থ্য আমার নাই। নিজের এই অক্ষমতা স্বীকার করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না।

দারুণ অক্ষমতাসত্বেও একটি প্রত্যক্ষ সত্যের উল্লেখ না করিয়াও উপায় দেখি না।

চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষ বঙ্গমাতার দুই সুসন্তান তুল্য শক্তিধর ছিলেন বলিয়াই বোধ করি একে অপরকে শক্তিযুদ্ধে পরাভূত করিতে পারেন নাই। একে যদি অপরের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলার শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত; হয়ত বা শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমাজের ও দেশের গতি প্রকৃতিও ভিন্ন পথাবলম্বী হইত। বাঙ্গলার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না—সংহার কার্য্যও চিত্তরঞ্জন সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, আশুতোষের পক্ষে রক্ষাকার্য্যও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। অনেকে গোলামখানার সম্পর্ক ছেদন করিয়াছিল।

'ন্যাশানাল এডুকেশন' প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত করিবার চেষ্টা এই সময়েই পরিলক্ষিত হইল। চিত্তরঞ্জন দাশ ন্যাশানাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুভাষচন্দ্র অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। সুভাষ-চন্দ্রের জীবনের স্বপ্ন এতদিনে সফল হইতে চলিল। তাঁহার পিতা (রায় বাহাদুর) জানকীনাথ বসু যখন তাঁহাকে, বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির

হইবার পর, এম, এ পড়িবার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াইয়া বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তখন প্রস্তাবটি সুভাষের ভাল লাগে নাই। সম্ভবতঃ দুইটি কারণে, অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহাকে পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে বিলাতে যাইতে হইয়াছিল। দুইটি কারণের প্রথমটি ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সাধনার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতবর্ষে পিতৃ আজ্ঞায় পুত্র মাতার প্রাণ বধ করিতেও পারে; পিতার প্রতিজ্ঞার মর্য্যাদা রক্ষার্থ পুত্রকে রাজসিংহাসন, রাজপ্রাসাদ, রাজভোগ, রাজৈশ্বর্য্য বর্জ্জন করতঃ বনবাস করিতেও দেখা গিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষের লোক—

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম

মন্ত্র দ্বারা পিতৃবন্দনা করিয়াছে। পিতার ইচ্ছা পরিপূরণে স্বীয় ইচ্ছা বলি দিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের পক্ষেও, প্রথম কারণ—

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

দ্বিতীয় কারণ, পারিবারিক আবহাওয়া। তাঁহার অগ্রজবৃন্দ, প্রায় সকলেই বিলাত-ফেরত; বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তখনকার-কালের সমাজেরও সেই অবস্থা। সমাজে যাঁহারাই অর্থবান ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের বংশধরগণকে বিলাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পাঠাইয়াছেন। তখনকার দিনে, সমাজে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বিলাতের সহিত ঐ সম্পর্ক না পাতিলে চলিত না। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে

'আমিই শুধু রইনু পড়ে'

ইহা সম্ভব ছিল না।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ—সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও সুভাষচন্দ্র সুখী হইতে পারেন নাই। সিভিল সার্ভিসে ঢুকিয়া হাকিমী করিতে হইলে তরুণের স্বপ্ন সফল হইত না।

তাই সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান এবং ইংরাজী রচনায় সর্ব্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াও অপ্রসন্ন চিত্ত প্রসন্ন হইল না। যে পাঠ সম্পূর্ণ করিতে পারিলে এবং যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, উত্তরকালে শিক্ষকতার কার্য্য করিতে পারা সম্ভব হইবে, সেই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে উদ্যত হইতে দেখা যায়।

চিত্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশানাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়া সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই সুখানুভব করিয়াছিলেন। ছাত্র সমাজের সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ সম্ভবতঃ এখনই হইল। ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে উচ্চ হইতে উচ্চতর, সর্ব্বশেষে সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেও, ছাত্র ও যুবসমাজের নিকট হইতে সুভাষচন্দ্র একটি দিনের তরেও দূরে চলিয়া যাইতে চাহেন নাই—দূরে যাইতে পারেন নাই। ছাত্র ও যুবসমাজের—সেই রাজ্যের তিনি ছিলেন, রাজাধিরাজ। অনেক সময়ে, অনেকবার ছাত্র সমাজে ভাঙ্গন আসিয়াছে, ছাত্র-সমাজ ভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বহু দল ও বহু নেতা দেখা দিয়াছে কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রভাব একদিনের জন্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইতে দেখা যায় নাই।

১৯৪৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী দিবসে (বাঙ্গলা ২৩এ মাঘ ১৩৫২) শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা হইয়াছিল। সরস্বতী বিদ্যাদায়িনী দেবী; ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সরস্বতী পূজার সমারোহ তরুণ সমাজেই সমধিক। ইংরাজী ১৯৪৬, বাঙ্গলা ১৩৫২ সালের বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তে ভগবতী ভারতী দেবীর পূজা মণ্ডপ সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে ভরিয়া গিয়াছিল; জয় হিন্দ ও নেতাজির জয় ধ্বনিতে পূজার মন্ত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার তর্ক উত্থাপন করিতে আমি চাহি না। ইহাতে বিস্ময় বোধ করিবার কারণও দেখি না। সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ যে ভারতের ভাব স্রোতে

ইন্দ্রের ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহাতে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশও আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ভারতের সেই ভাব মন্দাকিনীতে তরুণই অবগাহন স্নান করিয়াছে; স্বাভাবিক নিয়মে তাহারা ভাব মন্দাকিনীর ভাব প্রবাহে—অনুকূল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে আবার প্রতিকূল স্রোতের সঙ্গে তাহারাই যুদ্ধ করিয়া বেড়াইয়াছে। নেতাজীর সৌম্য মূর্ত্তি, নেতাজীর শৌর্য্য বীর্য্য, নেতাজীর ফৌজ তাহাদিগকে নূতন রূপে, নূতন ভাবে, নূতন মন্ত্রে, নূতন আদর্শে সঞ্জীবিত, উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছে। সরস্বতীর যে আসর বীণার মৃদু ও করুণ ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইত, 'জয় হিন্দ' সিংহ গর্জ্জনে সেই আসর নিনাদিত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। বিদ্যাদায়িনী বীণাপাণির পূজা মণ্ডপও কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকায় আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। ইহাও স্বাভাবিক। কংগ্রেস, নেতাজী, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম্ সমস্তই ভারতবর্ষের তরুণ মনে এক, অভিন্ন ও ওতপ্রোত বিজড়িত। স্বাধীনতার আকাঙ্খার সঙ্গে ইহারা অঙ্গাঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার সাধ্য ভারতবর্ষে কাহারও নাই।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা কথা এইখানে বলিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। হয়ত না বলিলেও চলিত; হয়ত ভুল বুঝিবার সম্ভাবনাও আছে; হয়ত নিন্দা অপযশের ভাগী হইতেও হইতে পারে। তথাপি কথাটা বলার প্রয়োজন অস্বীকার করিতে পারিতেছি না।

কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে। কংগ্রেসে পৌত্তলিক হিন্দুর সংখ্যাধিক্য থাকিলেও কংগ্রেস কোনদিন সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেয় নাই। অনেক সময়ে হিন্দু সমাজ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। সেই ক্ষোভের অগ্নিকুণ্ড হইতে হিন্দু মহাসভা নামক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছিল। পৌত্তলিক হিন্দুর

প্রতিমা পূজার আসরে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকার বাহুল্য দর্শনে সাম্প্রদায়িক দুষ্টবুদ্ধি অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেসকে দায়ী না করিতে পারে এমন নহে। অথচ স্বাধীনতার অত্যুগ্র আকাঙ্খাকে সমাজ-জীবনের অনুষ্ঠান হইতে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন করাও যে সহজ ও সম্ভব নহে, তাহাও বুঝিতে পারি। এই সমস্যা একদিন উদ্ভূত হইবে এবং সমাধান সহজ হইবে না আশঙ্কা করিয়াই কথাটা এইখানে বলিয়া রাখিলাম।

সরস্বতী পূজার কথা বলিতেছিলাম। একদিন একটি সরস্বতী পূজার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে কি ভাবে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল, তাহাও এইখানে বলিতে ইচ্ছা করিতেছি।

কলিকাতার সিটি কলেজটি ব্রাহ্ম সমাজের সমাজপতিগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। একবার সিটি কলেজের ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ সরস্বতী পূজার উদ্যোগ আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি মিলিল না। কর্ত্তৃপক্ষ পুতুল পূজার বিরোধী, অনুমতি পাওয়া যাইবে না জানিয়াও ছাত্রগণ নিরস্ত হইল না। পিতার বিরুদ্ধে পুত্র, শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্র, অভিভাবকের বিরুদ্ধে নাবালক, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণ —দেশের প্রায় সকল স্তরেই এই ভাব কঠোর হইয়া উঠিয়াছে তখনকার দিনে। সিটি কলেজের ছাত্রাবাসও কর্ত্তৃপক্ষের মতের বিরুদ্ধে প্রতিমা পূজায় দৃঢ় সঙ্কল্প। সুভাষচন্দ্রের সমর্থন ও সহানুভূতি ছাত্রবর্গের পানে প্রধাবিত। সঙ্ঘর্ষ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করিল।

ব্রাহ্ম সমাজপতিগণ বলেন, অপরের ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত হানা হইতেছে।

সুভাষচন্দ্র বলেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। পুলিশে ও বিদ্যায়তন-পরিচালকে পার্থক্য নাই।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও এই আবর্ত্তে নামিতে হইল।

সাধারণতঃ কবি সম্প্রদায়গত ধর্ম্ম বা বিশ্বাসের বিতর্কে অবতীর্ণ হইতেন না এবং ভেদবুদ্ধির বিকাশ যেখানে হইত, সেখান হইতে সযত্নে দূরে অবস্থান করাই ছিল তাঁহার অভ্যাস। কিন্তু এই বিরোধে তাঁহাকে অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হয়ত ব্রাহ্ম সমাজের শিরোমণিদের আকুল আহ্বান উপেক্ষা করিবার মত দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। হয়ত বা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের প্রভাব অতিক্রম করাও সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি বিদ্বজ্জনগণ কবির বন্ধুগণ মধ্যে পরিগণিত ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সুভাষচন্দ্রকে বিচলিত করিতে পারে নাই; তরুণ-ছাত্র-সমাজ তাঁহার হৃদয়ের আসনে অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথও সে সঙ্কল্প হইতে চ্যুত করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল প্রভাবও ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্কোচের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে সুভাষচন্দ্রকে নিরস্ত করিতে পারে নাই।

সিটি কলেজ তদবধি সুভাষচন্দ্রকে বর্জ্জন করিয়াছিল। কলেজের ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণের চেষ্টাতেই হোক, অথবা কর্ত্তৃপক্ষের প্ররোচনাতেই হোক, ঠিক মনে নাই, তবে মনে আছে, সুভাষ-বর্জ্জনের প্রস্তাব কলেজে অথবা ছাত্র সভায় গৃহীত হইয়াছিল।

এই ঘটনাটি একটি বিশেষ কারণে আমার মনে আছে। তাহাই বলিব।

১৯৩৮ সালে, সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং সমগ্র ভারতের ছাত্র সমাজ আনন্দে—সমুদ্র মন্থনকালে, সমুদ্রের মতো—উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। সুভাষের নির্ব্বাচন তরুণের জয় সূচিত করিতেছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে তরুণের দল তরুণের রাজাধিরাজ সুভাষকে অভিনন্দিত করিবার জন্য উদগ্রীব ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সকল সমারোহে সুভাষের

অরুচিও নাই, আলস্যও নাই! যে যেখানে আহ্বান করে, সেখানেই যান্; মাল্যের স্তূপ জমে; অভিনন্দনপত্রের পর্ব্বত রচিত হয়। আমাদের এই কলিকাত সহরে এমন স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, ব্যায়াম সমিতি, খেলার মাঠ ছিল না যেখানে না তাঁহার সাদর আহ্বান আসিয়াছিল; যেখানে না সেই উচ্চাসনটিতে তাঁহাকে বসিতে হইয়াছিল; যেখানে না মাল্য ধারণ করিতে হইয়াছিল; অভিনন্দন কুড়াইতে না হইয়াছিল; বক্তৃতা দিতে না হইয়াছে। হয়ত কর্পোরেশনের সভায় যোগ দিতে পারেন নাই, হয়ত রাজনৈতিক সভা সমিতিতে অনুপস্থিত থাকিতে হইয়াছে, কিন্তু তরুণের আহ্বান কদাচ উপেক্ষিত হয় নাই। এক কথায় সুভাষ ছিলেন, চির-তরুণ এবং দেশের তরুণ ছিল তাঁহার চিরদিনের সহচর।

কলিকাতা সহরে, আমার যতদূর মনে আছে, একমাত্র সিটি কলেজই রাষ্ট্রপতির প্রাপ্য, সুভাষচন্দ্রের ন্যায্য সম্মান দানে বিরত ছিল। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ সুভাষের উপর সন্তুষ্ট না থাকিলেও ছাত্র সম্প্রদায়কে তাঁহারা নিরস্ত করিতে পারেন নাই, সেণ্ট জেভিয়ার্সও রাষ্ট্রপতির সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। সিটি তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে।

একদিন মধ্যাহ্নে এলগিন রোডে গিয়াছি, একতলের বসিবার ঘরটি জনাকীর্ণ। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে চিনিতেন, কাজেই ওয়েটিং রুমে লোকারণ্যর মধ্যে বসিয়া, দর্শন-প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে হইল না, দ্বিতলে প্রেরিত হইলাম। আহারান্তে সুভাষচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন। কথা আরম্ভ করিয়াছি, ক্ষুদ্র এক খণ্ড কাগজ আসিল।

টেবিলের উপর ঐরূপ কাগজখণ্ড অনেকগুলি জমিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র একবার মাত্র দেখিয়া, কাগজগুলি কাগজ চাপা দিয়া

রাখিয়া দিতেছেন। কিন্তু এই টুকরাটুকু দেখিবামাত্র বলিলেন, নিয়ে এসো। বলিয়া কাগজটুকরাটিকে গাদায় না রাখিয়া আলাদা করিয়া রাখিলেন। যেহেতু আমি অন্ধ নহি এবং কাগজখণ্ডটুকু তিনি গোপন করেন নাই, আমার দৃষ্টি না পড়িয়া পারে না। নামটী মনে নাই; তবে পদাধিকার স্মরণ আছে।

"সেক্রেটারী, সিটি কলেজ ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন।"

একটু পরে একটি সুকুমার সুদর্শন যুবক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতে, সুভাষচন্দ্র নিকটস্থ চেয়ারে বসিতে বলিলেন।

যুবাপুরুষটি মুখস্ত পড়া বলার মত এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেলেন, সিটি কলেজে আপনার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি সাধারণ সভা ডাকিয়া আমি বিপুল ভোটাধিক্যে সেই 'ব্যান্' অপসারিত করিয়াছি এবং আপনাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাবও পাশ করাইয়াছি। এখন আপনাকে একদিন আসিতে হইবে। কবে আপনার সুবিধা হইবে বলুন?

ভাল ভাল উপন্যাসে সেই যে লেখে, বুকের উপর হইতে গুরু ভার—পাহাড় নামিয়া গেল, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, সুভাষচন্দ্রের সুপ্রসন্ন আনন দেখিয়াই বুঝিলাম যে উপন্যাসকারেরা ভুল লেখে না; পর্ব্বত সত্য সত্যই নামে।

দিনক্ষণ বিচারের অবসর ছিল না। সুভাষচন্দ্র সাগ্রহে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। যুবক একটা দিন ও সময় ধার্য্য করিয়া, নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। পরে এই যুবকের পরিচয় পাইয়াছিলাম, যুধাজিৎ চক্রবর্ত্তী। আরও পরে আরও জানিয়াছিলাম, যুধাজিৎ সুপণ্ডিত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর আত্মজ। অজিত বাবুরাও ব্রাহ্ম এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্টতম। তাহা সত্বেও যুধাজিৎ যাহা করিয়াছে, তাহাতে

ব্রাহ্ম সমাজ ও সমাজের সুহৃদ্বর্গের মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কারণ থাকিলেও, তরুণের অন্তরের অনুভূতির এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ অভিনন্দিত হইবার যোগ্য।

এই ঘটনায় তারুণ্যের অভিযানে সুভাষচন্দ্রের দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হইল।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়াখণ্ডে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বাল-সেনা যে সুভাষচন্দ্রের নামেই সম্মোহিত হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি!

একাদশ স্তর—জীবন বেদ

"To-day I must die that India may live and win freedom and glory."

ঐ একটি মাত্র ছত্রের অনুবাদ করিতে বসিয়া দেখিতেছি, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছি ভাবিয়া যে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি, তাহা কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর!

ঐ যে ছত্রটি, সেটি একদিন সুভাষের লেখনী হইতে বাহির হইয়াছিল। লেখনীমুখে শব্দচয় বাহির হইয়াছিল সত্য; ভাষা অন্তরের! অন্তর ছাড়া অন্তরের ভাষা কে বলিতে পারে? বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা বাঙ্গলার শাসন কার্য্যে সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি, কদাচারের বন্যা বহাইয়া দিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটা ক্রমশঃ তিক্ত হইতে তিক্ততর হইয়া উঠিতেছে। মন্ত্রীসভা যোগ্যতার আদর করেন না; কর্ম্মক্ষমতার কদর নাই; মন্ত্রীবর্গের আত্মীয় কুটুম্ব ও ধর্ম্মভ্রাতারাই সকল স্তরে অনুপ্রবেশ করিতেছেন। বঙ্গদেশের হিন্দু অধিবাসিদের মনে অসহায় ও নৈরাশ্যের ভাব পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশে কংগ্রেস বহুধা বিচ্ছিন্ন, শক্তিহীন ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলাদেশে নেতা বলিতে কেহ নাই; সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। সুভাষ থাকিতেও নাই!

তাঁহাকে তখন নজরবন্দী অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে!

শুধু তাহাই নহে। ১৯৩৯ ও তৎপরবর্ত্তীকালের ঘটনা পরম্পরায় তাঁহার মনেও যেন হতাশার সঞ্চার হইতে সুরু

করিতেছিল। যে সুনীল সুনির্ম্মল চিত্তাকাশে কখনও মেঘের চিহ্ন দেখা যায় নাই, যদি বা কখনও মেঘ আসিয়াও থাকে, শরতের খণ্ড ও লঘু মেঘ নীল নভোমণ্ডলে ঢাকাই মসলিন পরিয়া আসিয়াছে, খেলিয়াছে, নাচিয়াছে আবার অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—আকাশ যে নীল, যে নির্ম্মল, সেই নির্ম্মল নীলিমায় নয়নমন স্নিগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ১৯৩৯—দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পর হইতে সে কথা আর বলা যায় না। এখন হইতে শরতের লঘু মেঘ নয়, কৃষ্ণ মেঘ, এবং শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারার তলে নীলিমা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

যে সুভাষ এক বৎসর পূর্ব্বে হরিপুরায় কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে সমগ্র দেশকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইতে আবেদন জানাইয়াছিলেন; দক্ষিণ বাম, অগ্র পশ্চাৎ, উদার সঙ্কীর্ণ সমস্ত মতবিভেদ সত্বেও কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকানিম্নে সম্মিলিত হইবার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আকুল আহ্বান করিয়াছিলেন, এক বৎসর পরে সেই সুভাষই যে রামগড়ে—যেখানে কংগ্রেস সভাধিবেশন হইতেছে, তাহারই অদূরে এ্যান্টি-কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজন করিবেন, ইহা কি কেহ কোনদিন কল্পনা করিতেও পারিয়াছিল? সুভাষ-কংগ্রেসের নাম সত্যই এ্যান্টি-কংগ্রেস নহে; নাম ছিল, এ্যান্টি-কমপ্রোমাইজ কনফারেন্স! কিন্তু আসলে বৃদ্ধ ও গান্ধী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গরলোদ্গার! প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইয়াছিল।

কোথায় (কম্‌প্রোমাইজ) আপোষ? কাহার সহিত আপোষ? কে করিতেছে আপোষ? কাহার সঙ্গে আপোষ?—কোথায়ও কিছু নাই, কল্পিত আপোষের বিরুদ্ধে বিরামবিহীন আপোষহীন সংগ্রাম সুরু হইয়া গেল! এ যেন বাতাসের সঙ্গে অসি যুদ্ধ।

রামগড়ে দুইটি অধিবেশনই খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। বৃদ্ধ কংগ্রেস মামুলী প্রথায় তাহার সাম্বৎসরিক

কার্য্য পরিচালিত করিয়া চলিয়া গেল। নবীন কংগ্রেস—ফরওয়ার্ড ব্লক প্রাণ ভরিয়া মন খুলিয়া গলা ফুলাইয়া বৃদ্ধ কংগ্রেসকে দুয়ো দিয়া, ধিক্কার দিয়া, বৃটিশ বিতাড়নের একশেষ করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। তখনকার দিনের দুই একখানি সংবাদ পত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ পাঠে সত্যই পাঠকের মনে হইত, বৃদ্ধ কংগ্রেস হাজারিবাগ জেলার রামগড় হইতে ফিরিয়া—হোমিওপ্যাথী আর্নিকামণ্ট থার্টি—গুটিকয়েক গুলি খাইয়া ও আহত স্থানে গরম চূণ হলুদের প্রলেপ দিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছে। শীঘ্র আর উঠিতে হইবে না। সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রে এই বিশ্বপ্লাবী আত্মপ্রসাদের প্রবাহ কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্যের উত্তাপের চেয়ে, বালুকার উত্তাপ চিরকালই অধিক ও অসহ্য।

মনে করা অস্বাভাবিক নহে যে, সুভাষচন্দ্রের চিত্ত প্রসন্ন ছিল না। প্রতি পদবিক্ষেপে ভুল হইতেছে জানিয়াও ভুল পথ পরিহারের উপায় নাই বলিয়া অগ্রসর হইতে হইতেও, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাইতেছিল ইহা মনে করিলে অন্যায় হইবে না। ভুলের সহিত মানুষের জেদের এই রকমের একটা অবিভাজ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ চিরদিনই আছে। মানুষ যত ভুল করে জেদ তাহার ততই চড়িয়া যায়। আমি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া-পাগল দেখিয়াছি, বাড়ী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, আসবাব নিলামে চড়িয়াছে, স্ত্রীর গহনা পোদ্দারের গর্ভে আত্মগোপন করিয়াছে, সংসারের চারিভিতে অন্ধকার জমাট হইয়া উঠিতেছে, তবুও রেসের নামে ধমনীর শোণিত চঞ্চল হইয়া উঠে, রেস গাইড চোখে পড়িলে আত্মহারা হইয়া পড়ে; আবার—আবার সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে ছুটিয়া সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ চাপায়। মদ্যপেরও এই দশা। মামলার নেশাও মানুষকে এমনই ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যায়।

আমি স্থানান্তরে সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লককে বিশ্বামিত্র ঋষির নবীন জগতের সহিত তুলনা করিয়াছি, তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। উপমাটা দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করিতে হইতেছে। কিন্তু কেন এই উপমা, তাহা বলিবার পূর্ব্বে পুরাণের গল্পটি সংক্ষেপে বলি!

বিশ্বামিত্র মহাতপা ঋষি। তাঁহার তপোবলে ত্রিভুবন থরহরি কম্পান্বিত। মর্ত্ত্যের মানুষ মানুষীরা যেমন মান্য করিত, স্বর্গের দেব দেবীরাও তাঁহাকে তেমনই সমীহ করিত। একদা দেবতাদের সহিত বিশ্বামিত্রের বিরোধ বাধিয়া গেল। বিশ্বামিত্র সর্ব্বশক্তিমান! দেবতাদের অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন, দেবতারাও তাঁহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন। একটি বেচারা রাজা ত্রিশঙ্কু অনেক পূণ্য কর্ম্ম, অনেক ভাল ভাল কাজ করিয়া সশরীরে স্বর্গ গমনে অভিলাষ করিলেন। দেবতারা পাসপোর্ট দিলেন না। ভিসা বা পাসপোর্ট ব্যতিরেকে স্বর্গ রাজ্যে যাওয়া যায় না। কোন্ কালা আদমী বিনা পাসপোর্টে বিলাতে ঢুকিতে পারে? অথচ সশরীরে স্বর্গ প্রাপ্তির প্রথাও নাই। ত্রিশঙ্কু-বেচারী খানিকটা পথ উঠিয়া পড়িয়াছেন, আর খানিক উঠিলেই হয়। কিন্তু স্বর্গের পাহারাওলা, কাষ্টমস দারোগা, ভিসা পরীক্ষক সকলে একযোগে "তিষ্ঠ" "তিষ্ঠ" Thus far and no farther করিয়া উঠিল।

বেচারা ত্রিশঙ্কু 'তেশূন্যে' ঝুলিতে লাগিলেন। উঠিতেও পারেন না, দেবতারা নারাজ; নামিবারও সাধ্য নাই, মহাতেজা ঋষি রুষ্ট হইবেন, চাই কি ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারেন!

বিশ্বামিত্র রাগের মাথায় একটা নবীন স্বর্গই সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বামিত্র-রচিত স্বর্গ দেবতাদের স্বর্গের অপেক্ষা ন্যূন অথবা হীন হয় নাই, কঠোর ও নিরপেক্ষ সমালোচকগণও (সেকালেও তাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন!) স্বীকার করিতে বাধ্য

হইলেন। কিন্তু, এত করিয়াও, বিশ্বমিত্রের চিত্তে সুখ বা শান্তি ছিল না। বিরোধের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া অবসাদ প্রবল প্রতাপ ঋষিবরকেও আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। আমার গল্পের সহিত সামঞ্জস্য এই পর্য্যন্ত। সুভাষচন্দ্রকেও শেষ পর্য্যন্ত অবসাদে-অভিভূত ও ক্লান্ত দেখিতে পাই।

"আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? ভারত বাঁচিয়া থাক্, ভারত স্বাধীনতা অর্জ্জন করুক; ভারতের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক।"

এই উক্তির ভিতরে সুভাষের বলিষ্ঠ ও পৌরুষপ্রদীপ্ত অন্তর প্রতিফলিত তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও, হতাশার ও অবসাদের করুণ সুরও যে ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে (তারিখটি ঠিক মনে নাই—২৬এ কিম্বা ২৭এ। অন্তর্দ্ধানের এক বা দেড়মাস পূর্ব্বে, এ'টি মনে আছে) সুভাষচন্দ্র একখানি দীর্ঘ পত্র বাঙ্গলার তদানীন্তন গভর্ণরের উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন। যে স্বাধীনতার আকণ্ঠ পিপাসা, সারাজীবন উল্কার বেগে প্রধাবিত করিয়াছে; অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে স্ফীতবক্ষে দাঁড় করাইয়াছে; শক্তি অথবা শক্তিমানের নিকটে বশ্যতা স্বীকার যাঁহার জীবনের গতি-পথের অজ্ঞাত, ও অকল্পিত, এই পত্রে তাহারই পূর্ণ অভিব্যক্তি।

"Life under existing circumstances is intolerable to me. To purchase one's continued existence by compromising with illegality and injustice goes against my very grain."

রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী নাটকে কুমার সেনের উক্তিতে আছে—

"It is for me to decide whether I choose to live or to die."

সেই হতাশা, সেই অবসাদ, জীবনে সেই বিতৃষ্ণা। এই সুর

সুভাষের নহে ; কোন বলবান, বীর্য্যবান, শৌর্য্যশালী নেতার কণ্ঠেরও সুর ইহা নহে ! পথশ্রান্ত, রণক্লান্ত, বিগতস্পৃহ জীবনের ভাষা হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শের সহিত ইহার সামঞ্জস্য বিধান কিরূপে করা যায় ? অথচ এমন অটল, অচল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ সুভাষ ব্যতীত আর কে আছে যে বলিতে পারে—আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি ? ভারত ধন্য হৌক !

সুভাষের জীবন কি জীবনব্যাপী সংগ্রামেরই জীবন নহে ? কিশোর বয়সে, নির্জ্জনে, গহন, গিরিগুহায় গুরু অন্বেষণে ভ্রমণ, সে'ও ত সংগ্রাম ! স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া, সে'ও ত সংগ্রাম ! সার্ভিস পরিত্যাগ, সে'ও ত সংগ্রাম ! দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গান্ধী আশ্রমে গমন ও হতাশ হইয়া প্রত্যাগমন, সে'ও ত সংগ্রাম ! ১৯৩৮ সালে, কংগ্রেসের হাই কমাণ্ডের নির্দ্দেশে নাগপুরের ডাক্তার খারের নির্ব্বাসন-দণ্ডে সম্মতি দান, সে যে কত বড় সংগ্রাম, একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন ! সুভাষের বঙ্গদেশে, সুভাষের স্বদেশবাসী-পরিচালিত গভর্ণমেন্টের সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিল আবর্ত্তে পতিত হইয়া ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রগমন, চোখের উপরে তাহাই দেখিতে হইতেছে, অথচ গতিরোধে শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, অন্তরের এই দাবদাহ, সে কি কম সংগ্রাম ? সেই দাহ যে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিতেছে, অথচ প্রতিকারের পথ নাই, শক্তি নাই, সে'ও কি কম সংগ্রাম ? অন্তর বীণায় হতাশার সুর যে ঝঙ্কৃত হইতেই পারে, তাহাতে বৈচিত্র্য বা বিস্ময়ের কোন্ কারণ থাকিতে পারে ? আমি যাই—আমি মরি, ইহাও সেই হতাশাক্লিন্ন অন্তরের কথা বটে ; কিন্তু শেষ কথা নহে। শেষ কথা—ভারতবর্ষ অক্ষয়, অব্যয় হৌক।

কংগ্রেস তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াছে, দুঃখের কথা বটে ; কিন্তু তাহাই শেষ কথা নহে। কংগ্রেসেরই বা কি ভবিষ্যৎ ? সেই মাঝে

মাঝে জ্বলিয়া উঠা, জেল যাওয়া, কারামুক্তির পরে আবার অসীম নৈরাশ্য। তাহাতেই বা আশা কি ? ভরসা কি ? সেই অন্ধকার, সেই হতাশা, সেই অনন্ত ও অফুরন্ত অবসাদ।

"বল বোন্ তাই বলো
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।"

কিন্তু এই মৃত্যু কাপুরুষের মৃত্যু নহে ; যে মৃত্যুর আগে মানুষ "মরে বার বার" সে মৃত্যু ইহা নহে !

"এই মরজগতে, নশ্বর ধরণীতে সবই লয় প্রাপ্ত হয়, সবই ধ্বংস হইবে ; কিন্তু আদর্শের বিনাশ নাই, চিন্তার বিলোপ হয় না, স্বপ্নের বিলয় ঘটে না। একটি মানুষ তাহার আদর্শ বক্ষে আঁকড়াইয়া মরিতেও পারে কিন্তু আদর্শের মৃত্যু নাই ; তাহার মৃত্যুর পরে সেই আদর্শ শত সহস্র লক্ষ কোটী মানুষের অন্তরে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। পৃথিবীর বিবর্ত্তন এইরূপেই সাধিত হইতেছে ; শতাব্দীর পর শতাব্দীতে, এক কাল হইতে অন্য কালে আদর্শ, চিন্তা, স্বপ্ন উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষানুক্রমে বিবর্ত্তিত হইতেছে।

"আদর্শের জন্য জীবন ধারণ, আদর্শের জন্য জীবনপাত, ইহার অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, উচ্চতর মহত্তর কামনা মানুষের আছে কি ?

"মানুষ যদি কল্পনার দৃষ্টিতে দেখিতে পায় যে তাহার চিন্তা, তাহার স্বপ্ন ও তাহার আদর্শ রণে বনে, প্রান্তরে দুস্তরে, গিরিশিরে, নদীপারে, মহাসাগরের পারে, দেশান্তরে, যুগান্তরে, কল্পান্তরে, শতাব্দীর পরে, সমতলে, উপত্যকায় অধিত্যকায়, জাগ্রত, জীবন্ত মন্ত্রবৎ বিচরণ করিতেছে, তাহা হইলে এই নশ্বর জগতে, জরামরণশীল মানুষ কি অমৃতের স্বাদ আস্বাদ করে না ?

"আদর্শবাদী মানুষ যদি মরে, মরুক, কোন ক্ষোভ নাই, জাতি বাঁচিয়া থাক্ ! তাই আমি যদি আজ মরি, কোন্ ক্ষতি নাই—

আমার ভারতবর্ষ বাঁচিয়া থাক্; ভারতবর্ষ স্বাধীন হৌক; মহান ভারতবর্ষ মহিমময় হৌক!"

ভারতবর্ষে ইহাই সুভাষচন্দ্রের শেষ কথা। শুধু শেষ কথা নহে, সুভাষেরই যোগ্য কথা। এই কথা এমন করিয়া বলিতে সুভাষচন্দ্রই পারেন। মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন সুভাষেই সম্ভব।

জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে?
মক্ষিকাও গলে না গো
পড়িলে অমৃত হ্রদে!

১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসের শেষাংশে গভর্ণরকে লিখিত পত্রের যে কথাগুলি রত্নাকরগর্ভ হইতে সংগৃহীত রত্নরাজির মত উদ্ধৃত করিলাম, আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাই ভারতবর্ষে—স্বদেশে সুভাষচন্দ্রের শেষ কথা। ইহারই সঙ্গে এইখানে ভারত-সীমান্তের অপর পারে দেশান্তরে সুভাষচন্দ্রের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিবার মানস। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, অনন্ত অবসাদ, দুর্ব্বহ নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ে যে মানুষটি পরাধীন ভারতবর্ষে মৃত্যু বরণ করিতে চাহিয়াছিল; বলিয়াছিল, আমাকে মরিতে দাও; মরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করিও না, আত্মাহুতিতে বাধা দিও না, সেই মানুষ ভারতবর্ষের বাহিরে, পরদেশে, স্বাধীনতার অমৃত সুধা পান করিয়া নবজীবনের অরুণালোকে, নবজীবনের নূতন উদ্দীপনায়, নবজীবনের আশার দ্যুতিতে অন্তর ভরিয়া, বলিতেছে—

আমি চিরদিন আশাবাদী; আশায় বাঁচিয়া থাকি। পরাজয় বরণ করিতে আমি জানি না, আমি পরাজয় বরণ করিতে পারি না। স্বাধীনতার দুর্ম্মদ রণে, স্বাধীনতার দুর্গম পথে জয়ও আছে, পরাজয়ও আছে। বিপর্য্যয়ে দুঃখের কারণ নাই;

বিপর্য্যয়ে হতাশ হইতে নাই! ইম্ফলের সমতলভূমির যুদ্ধে, আরাকানের দুর্ভেদ্য অরণ্যরণে, ব্রহ্মদেশের তৈলখনির সন্নিকটস্থ সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজ বীরত্বের যে গৌরব নিশান উড্ডীন করিয়াছে, আকস্মিক বিপর্য্যয়ে, একবারের পশ্চাদাপসরণে তাহার গৌরব মলিন হয় নাই; বরং ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস এই বিপর্য্যয়ের কাহিনী বক্ষে ধারণ করিতেও গৌরব অনুভব করিবে; এই পরিচ্ছেদ স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিবে। জয় হিন্দ!"

একদিন, বোধ হয় ১৯৩৮ সালে, কলিকাতায় দর্জ্জিপাড়ার অভ্যন্তরে ব্ল্যাক-অয়ার স্কোয়ারের এক সম্বর্দ্ধনা সভায়, অনভ্যাস এবং অনিচ্ছাসত্বেও কিছুক্ষণের জন্য আমাকে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। ক্ষুদ্র উদ্যান, সেদিন প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভ বা অর্দ্ধকুম্ভের রূপ ধারণ করিয়াছে। সুগৌরকান্তি, সৌম্যমূর্ত্তি, প্রশান্ত চিত্ত সুভাষচন্দ্র উপবিষ্ট। সেচ্ছাসেবকবাহিনীর পোষাক-পরিহিত কতিপয় বালক হার্মোনিয়ম-সহযোগে মাতৃবন্দনা-গান গাহিতেছে—

ভারত আমার ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র

গীত সমাপ্ত হইল; মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনিত হইতে লাগিল; মধুর ও ভাবোদ্দীপক সংগীত, সুকণ্ঠ গায়ক। সভাস্থলে, জনমর্দ্দ যেন অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। হঠাৎ সুভাষচন্দ্রের পানে চাহিতে দেখি, চোখে জল। জল ঢল ঢল, অবিরল ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক গান—বিশেষ করিয়া ভারত-বন্দনা গানগুলি সুভাষচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিল। "ভারতবর্ষ" ও "ভারত আমার ভারত আমার" গান দু'খানি তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষকে এত ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই না লাটকে

লিখিয়াছিলেন, আমি মরি তাহে ক্ষতি কি ? আমার ভারতবর্ষ অক্ষয়, অব্যয় হৌক !

ভারতের স্বাধীনতা তাঁহার চরম ও পরম ধ্যান, জ্ঞান, বাসনা সাধনার ধন হইয়াছিল বলিয়াই না "জয় হিন্দ" তাঁহার কর্ম্ম ও চিন্তা, আরাম ও আয়াস, যুদ্ধ ও শান্তি, স্বপন ও জাগরণ আছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ?

জয় হিন্দ ! ভারতের জয় হৌক !

দ্বাদশ স্তর—হিসাব নিকাশ

গান্ধীজী কি আজও ভারতের সর্ব্বজনমান্য নেতা আছেন ?

ইংলণ্ডে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, ভারতবর্ষে গান্ধীজীর প্রভাব কি পূর্ব্বের মতই অক্ষুণ্ণ আছে ?

অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছে যে, ভারতবর্ষের নেতৃত্ব গান্ধীজীর হস্তচ্যুত হইয়া সুভাষ বোসের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এমনও হইতে পারে যে, একেবারে যদি চলিয়া না গিয়াও থাকে, তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই।

তাঁহারা বলেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। তাঁহারা ১৯৪৫ সালের শেষ কয়মাসের ঘটনাবলীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের অবসানের পর হইতে, ভারতবর্ষে ঘন ঘন খণ্ড যুদ্ধ হইতেছে, অকারণে প্রাণী হত্যা হইতেছে।

ভারতবর্ষে, ভারতের হিতকামী মনীষীগণকেও বিচলিত দেখা যাইতেছে। গান্ধীজীর মত স্থিরবুদ্ধি অবিচলিত চিত্ত ধীমান মানুষটিরও অস্থিরতা অপ্রকাশ নাই। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই সহরে অকস্মাৎ যখন খাণ্ডব দাহ সুরু হইয়া গেল, গান্ধীজী তখন বোম্বাই সন্নিকটস্থ পুণায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বোম্বাইয়ের কামান গর্জ্জন পুণায় শুনা গিয়াছিল কি-না বলিতে পারি না, কিন্তু গান্ধীজীর হতাশাবিক্ষুব্ধ অন্তরের আর্ত্তনাদ সমস্ত পৃথিবী শুনিতে পাইয়াছিল। গান্ধীজীর ব্যাকুল অন্তর গান্ধীজীকেই প্রশ্ন করিয়াছে, বোম্বাই মহানগরীতেই কি অহিংসা মন্ত্র সমাধিস্থ হইবে ?

কলিকাতা, করাচী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, কোন স্থানে আগে, কোথাও পরে—এইটুকু যা পার্থক্য, নতুবা কাহিনী সর্ব্বত্রই এক—শাসক

ও শাসিতের শক্তির পরীক্ষা। তুচ্ছ সূচনা, কারণও তুচ্ছ কিন্তু পরিণামে লঙ্কাকাণ্ড। ঘটনা মামুলী, পরিণতিও মামুলী। যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে এক পক্ষে, ন্যাসানাল এ্যামুনিসন্—ইট পাট্‌কেল, অপর পক্ষে বন্দুক, ব্রেণগান্ ও মেসিনগান্। মশা মারিতে কামান দাগিতে হয় আমাদের ঠাকুরমা ঠানদিদিদের উপাখ্যানে শুনা যাইত; ঢিল পাটকেল থামাইতে মেসিন গান বসানো হইল ইহা ভারতবর্ষের লোক চাক্ষুষ। ইটপাটকেলের কি অসামান্য শক্তি!

হিংসাপরিপ্লাবিত বিংশ শতাব্দীর বিশ্বেও যিনি অহিংসা পরম ধর্ম্ম মন্ত্র প্রচারে বিরত নহেন, অহিংসাকে যিনি জীবদেহে প্রাণবায়ুর সমতুল্য বিবেচনা করেন, বাক্যে ব্যবহারে, আচরণে মননে হিংসা যাঁহার চতুঃসীমা স্পর্শ করিতে পারে না, জীবনের অধিকাংশ কাল দেশের প্রত্যেকটি নরনারীকে সত্য ও অহিংসার প্রত্যক্ষীভূত আদর্শে উদ্বোধিত করিতে যিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, সম্প্রতিকার ঘটনাবলী যে তাঁহার মনোবেদনার কারণ হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

গান্ধীজীর জীবনের বেশীর ভাগ সময় বোম্বাই প্রদেশেই অতিবাহিত হইয়াছে। সবরমতী আশ্রম ও যারবাদা কাবাগার—দুইটিই বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত। মুক্তাবস্থায় সবরমতী, দণ্ডদশায় যারবাদা। এই বোম্বাই প্রদেশেই অহিংসা মন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল; সবরমতীর ঋষি এই বোম্বাই হইতেই আসমুদ্র হিমাচল অহিংসার বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন! আর এই বোম্বাই নগরীর প্রান্তপ্রবাহী সাগরতট হইতে শাসিত শাসকের উদ্দেশে কামান দাগিল। পুনা-প্রবাসী গান্ধীজীর মর্ম্মস্থল হইতে আর্ত্তকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, হায় আমার বোম্বাই নগরীই কি আমার অহিংসা মন্ত্রের সমাধিক্ষেত্র হইবে!

ইংলণ্ডের মনস্বী ব্যক্তিবৃন্দ মহা সমস্যায় পড়িলেন, সুভাষ বোসের রাজনীতি কি গান্ধীজীর রাজনীতিকে পরাভূত করিল?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি এমন ভরসা রাখি না; এই সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব বলিয়াও মনে করি না! তবে ঐ দুই মনীষীর রাজনীতির পার্থক্য—যদি কিছু থাকিয়াই থাকে—বিশ্লেষণ করা কঠিন না'ও হইতে পারে।

আই-এন্-এ সুভাষের রাজনীতি নহে; ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সশস্ত্র অভিযানও সুভাষের রাজনীতি নহে। প্রবল জ্বরের উত্তাপে বরফ প্রয়োগ বিধি হইলেও বরফ জ্বরের ঔষধি নহে। গ্যাংগ্রীণের ফলে কোন লোকের পা কাটিয়া বাদ দিতে হইয়াছে এই নজীরে ক্ষত হইলেই দেহাংশ কাটিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে, চিকিৎসাশাস্ত্রের ইহাই চরম বিধান নহে।

গান্ধীজীর সহিত সুভাষচন্দ্রের বিরোধ, গতি লইয়া। সুভাষচন্দ্র বিমানারোহণে দিল্লী যাত্রার অভিলাষী; গান্ধীজী কভু গো-যান, কভু শকট-যাত্রা, কভু বা নৌকারোহী। আর এই যে বিরোধ, তাহার বয়ঃক্রম সিকি-যুগ ত বটেই! বিলাতে, ভারত-কার্য্যালয়ে, ভারত সচিব মণ্টেগুর হাতে সিভিল সার্ভিসের ইস্তফাপত্র দিয়া, ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই বোম্বাই মহানগরীর মণি ভবনে যেদিন সর্ব্বপ্রথম গান্ধী সন্দর্শন হইয়াছিল সেই দিন, সেই প্রথম সাক্ষাৎকালেই মত বিরোধ, গতি বৈষম্য পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং অনুমান করিতে আদৌ কষ্ট হয় না যে সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তে, ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক হিমালয়ের এভারেষ্ট শিরে সমাসীন, ভারত-স্তম্ভ মহাত্মা গান্ধী, সেদিনের সেই অপেক্ষাকৃত অখ্যাত বঙ্গীয় যুবা পুরুষটির মধ্যে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সহযোগীকে চিনিয়া লইতে গান্ধীজীর বিলম্ব হয় নাই। সহযোগী কোনদিন প্রতিযোগী হইবে

কি-না, হইলে, প্রতিযোগিতা কতখানি প্রবল বা দুর্ব্বল রূপ ধারণ করিবে এ সকল কথা অবান্তর।

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে গতির তর্ক উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন হইতে প্রায় প্রত্যেকটি মাইল-পোষ্ট অতিক্রম করিবার সময়ে, তর্ক দুর্নিবার হইতে দেখা গিয়াছে। গান্ধী-আরুইন চুক্তি, দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের অধিবেশনে গান্ধীজীর লণ্ডন-যাত্রা, তৎপরবর্ত্তীকালে অসহযোগ আন্দোলন নিবারণ, তারপর শেষ-বেশ, ত্রিপুরী, সর্ব্বথা ও সর্ব্বত্র সেই এক বিতর্ক, গতি। ১৯৩৯ সালের কংগ্রেসের কথা বলিবার সময়ে আমি পট্টভি সীতারামিয়াকে শ্লথগতি এবং সুভাষচন্দ্রকে ঝঞ্ঝাগতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছি, স্মরণ থাকিতে পারে হিংসা অহিংসার তর্ক কোন কালেই উঠে নাই। এই তর্কের অস্তিত্বই ছিল না।

সুভাষের সঙ্গে হিংসার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা সুভাষের যৌবন কালেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ যেদিন ভগীরথের মত, স্বর্গ-মন্দাকিনী ত্রিপথগা জাহ্নবীকে ভারতের সমতলভূমিতে আনিয়া সগরবংশের উদ্ধার সাধনের ন্যায়, অভিনব ভাবধারার প্রবর্ত্তনে জাতীয় জাড্য ও ক্লৈব্যের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন সেদিন স্বরাজী চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে করতালি সহযোগে যে কয়জন অগ্রসাধক সেই ভাবধারাকে অভিনন্দিত করিয়া সারা ভারতবর্ষে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহাদেরই একজন। সেদিনের সেই স্বরাজীর জয়যাত্রার পরিপূর্ণাঙ্গ চিত্র আজ হয়ত হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে না; কিন্তু একটি কথা বলিলেই হয়ত সেদিনের চিত্রের কতকাংশের ধারণা করা সহজ হইতে পারিবে। স্বরাজীর রণরঙ্গাভিযানে সেদিন গান্ধীজীও পথ ছাড়িয়া দিয়া, হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এদেশের গভর্ণমেণ্টও নিরুদ্যম-নিশ্চেষ্ট দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই দিনই গভর্ণমেণ্ট সুভাষের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কুটুম্বিতার সন্ধান করিয়াছিলেন। "যে খায় চিনি, তার চিনি যোগান চিন্তামণি।" গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সুভাষে সন্ত্রাসে সম্বন্ধ বন্ধন আবিষ্কার করা কঠিন হইতে পারে না। অনতিবিলম্বে, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, স্বরাজীর সেকেণ্ড-ইন্-কম্যাণ্ড, চিত্তরঞ্জন দাশের দক্ষিণ হস্ত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ, কর্পোরেশনের সভায় বজ্রনাদ করিলেন! আমরা দেখিলাম, দুটি চোখে সহস্রধার। রাজনীতি গর্জ্জন করে; অপত্যস্নেহ কাঁদিয়া মরে। শুধু চিত্তরঞ্জন দাশই অশ্রু বিসর্জ্জন করেন নাই; সারা বঙ্গদেশ কাঁদিয়াছিল।

সেইদিন হইতে সুভাষের রাজনীতির সঙ্গে হিংসার বাষ্প সংমিশ্রণ হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম!

আজ, আবার এতকাল পরে সেই কথাটা উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষ কি গান্ধীনীতি বর্জ্জন করিয়া সুভাষনীতি গ্রহণ করিবে?

প্রশ্ন অনাবশ্যক ও অবান্তর।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা-স্বর্গের স্বর্ণ-সিংহদ্বারে উপনীত হইয়াছে। সেই স্বর্ণ-সিংহদ্বারের চৌকাঠ পার হইতে পারিলে, স্বাধীনতার স্বচ্ছতোয়া সুশীতল বারিধারায় অবগাহন স্নান করিতে পারিবে। সেই শান্তি-পবিত্র মন্দিরদ্বার হিংসায় অপবিত্র কেন করিবে? সেই অনাবিল সুনির্ম্মল জলধারা হিংসায় কলুষ, শোণিত আরক্ত কেন করিবে?

স্বাধীনতার আস্বাদ কে জাগাইল ভারতবাসীর প্রাণে? স্বাধীনতা যে মানুষের কামনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন, কে শুনাইল ভারতবাসীর কাণে?

কংগ্রেস!

স্বাধীনতা বস্তু বা পদার্থটা কি, তাহা এই চল্লিশ কোটীর মধ্যে চল্লিশ জনও হয়ত জানে না জানিলেও, কেতাবে পড়িয়া অথবা বক্তৃতায় শুনিয়া আবছায়া একটা ধারণা গড়িয়া লইয়াছে—বাস্তবের সঙ্গে, প্রত্যক্ষের সহিত হয়ত তাহার কোনই মিল নাই, কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই! হয়ত বা সে ধারণাও অনেকের হয় নাই। দেশ স্বাধীনতা পাইলে তাহার আর দুইটা হাত গজাইবে কিম্বা দ্বিপদ হইতে চতুষ্পদে উন্নীত হইবে, তাহাও সে জানে না। জমিদারকে রাজস্ব, কর্পোরেশনকে ট্যাক্স দিতে হইবে না, যাবতীয় ট্যাক্সেরই বিলোপ ঘটিবে; চাষের শ্রম না করিয়াও ভূমিতে সুবর্ণ উৎপন্ন করা যাইবে; দেহের রোগ নির্ম্মূল হইবে; বয়সে জরার প্রকোপ থাকিবে না; যৌবন চিরস্থির হইবে; গৃহে কলহ থাকিবে না; রাস্তার মোড়ে পাহারাওলা থাকিবে না; থানায় দারোগা থাকিবে না; জেলখানা বিলুপ্ত হইবে; লাট সাহেবের বাড়ীর দেউড়ীতে কামান থাকিবে না—চাই কিঁ সেই বাড়ীর ভিতরে গিয়া অবুরে সবুরে তাশ পাশা দাবা খেলিতে বাধা থাকিবে না—সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, স্বাধীনতার মর্ম্মকথা কেহ জানে না, কাহারও জানা নাই, তবু সে অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অভূতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া, কি ভাবে, কে তাহাদের চিত্তাকাশে ধ্রুবতারাটির মত অম্লান জ্যোতিতে আঁকিয়া দিল? এই কংগ্রেস!

সব কথা খুলিয়া বলে নাই; সকল চিত্র সম্পূর্ণ করিয়া আঁকে নাই; বুঝি তাঁহার প্রয়োজনও ছিল না। অব্যক্ত, অস্ফুট কভু বা নীরব ভাষার অন্তরালে যেমন একটা অজানা অসীম জগৎ কোলাহল করে, একটা অদেখা নীল সমুদ্র তরঙ্গায়িত হয়, কোন ভাবুকের ভাবনা, কোন শিল্পীর ব্যঞ্জনার যেমন প্রয়োজন হয় না, অতীব সঙ্গোপনে হৃদয়তন্ত্রীর তারে তারে প্রেমের সঙ্গীত গুঞ্জরিতে থাকে, পরাধীন জাতির নরনারীর

চিত্তবীণায় স্বাধীনতার সুমধুর ঝঙ্কার তেমনই নীরবে, তেমনই গোপনে অজানা মাধুর্য্যে অজানা আকুল আবেদনে ভরা অবিশ্রান্ত ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। এই ঝঙ্কারের সূচনা করিল কে? অনাদৃত উপেক্ষিত সুষুপ্ত সপ্ত তারে অঙ্গুলি পরিচালনা করিয়া এই সুর জাগাইল কে? এই কংগ্রেস!

দিকে দিকে সমারোহ, গৃহে গৃহে উল্লাস, অন্তরে অন্তরে উদ্দীপনা, মর্ম্মে মর্ম্মে উন্মাদনা—রণবাদ্যের তালে তালে অধীর আগ্রহে আন্দোলিত হইতে থাকে। স্বাধীনতার নামে মানুষের মন বসন্তাগমে নব বল্লরীর মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে যখন, তখন মনে হয় মানুষ বুঝি বা কংগ্রেসকেই অভিনন্দিত করে; কংগ্রেসকেই সম্বর্দ্ধনা জানায়।

কিন্তু সত্যই কি আমরা কংগ্রেসকে সম্বর্দ্ধনা করি?

কোন মানুষকে সম্বর্দ্ধনা নহে, কংগ্রেসকে নহে, কংগ্রেসের সভাপতিকেও নহে, মহাত্মা গান্ধীকেও নহে, এমন কি সুভাষ বোসকেও নহে। এই যে সম্বর্দ্ধনা, এই যে অভিনন্দন, এই যে অবনতি-প্রণতি-বিনতি, ইহা সেই অনাগত, অনাস্বাদিত, বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতার উদ্দেশে মঙ্গলাচরণ। স্বাধীনতার বোধন সমারোহ!

আজ দিকে দিকে তাহারই মঙ্গল শঙ্খধ্বনি! আজ দিকে দিকে তাহারই জ্যোতিরুৎসব!

বন্দে মাতরম্!

জয় হিন্দ!

পরিশিষ্ট—আজাদীর পথে

(আজাদ-হিন্দ সৈনিকের ডায়রী হইতে)

আজই কি পৃথিবীর শেষ দিন? আপরাহ্ন বেলা বৃষ্টি সুরু হইয়াছিল, অপরাহ্ন অতীতে সায়াহ্ন, সায়াহ্ন হইতে রাত্রি—রাত্রিও দ্বিতীয় প্রহর আগত প্রায়, বৃষ্টির বিরাম নাই। এমন বৃষ্টিও কভু দেখা যায় নাই। অবিশ্রান্ত মুষলধারা। মনে হইতেছে পৃথিবী ভাসিয়া যাইবার উপক্রম। একদিন ধরিত্রী জল-তল হইতে উঠিয়াছিল, আজ কি সেই ধরিত্রী সেই জল তলেই শয়ন করিবে? এ কি তাহারই সূচনা, তাহারই পূর্ব্বাভাষ?

আজই কি ধরণীর শেষ রজনী? আজিকার এই বিশ্বপ্লাবী প্লাবনের মধ্যেই সেই পরিচিত প্রিয় পুরাতন ধরণী বিলীন হইয়া যাইবে? কেহ দেখিতে পাইবে না, দেখিবার কিছু থাকিবে না। বিশাল জগৎ—জড় ও জীব জগৎ বক্ষে ধারণ করিয়া ধরিত্রী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে? বিগত কাল কি ছিল অথবা কে ছিল, কেহ জানিবে না; আবার অনাগত কালে কি হইবে, কে থাকিবে তাহাও কেহ জানিবে না। সকলের দৃষ্টির অগোচরে মানুষের এতকালের প্রিয় পরিচিত পৃথিবীর অবসান ঘটিবে, কেহ এক বিন্দু অশ্রু মোচন করিবে না, কেহ দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে না, কেহ শেষ সঙ্গীত শুনাইবে না।

আকাশে আকাশ নাই। তাই নক্ষত্র নাই, বিদ্যুৎ নাই, আকাশের সঙ্গে তাহাদেরও অবসান হইয়াছে। আছে শুধু জল। অবিরল ও অবিশ্রাম মুষলধারায় জল। শূন্যে জল, পায়ের নীচে জল। পৃথিবীর কোথাও কিছু নাই, কোথাও কিছু দেখা

যায় না, শুধুই জল! শব্দহীন স্তব্ধ নিশীথিনীর বুকের উপর দিয়া সোঁ সোঁ গোঁ গোঁ শব্দে জল ছুটিতেছে।

একটা পর্ব্বত অধিত্যকায় অনেকগুলি মানুষ বসিয়া ছিল। কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না, কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না। তবে সকলেই অনুমান করে, সকলেই আছে।

অপরাহ্ণ বেলায় এই পর্ব্বত অধিত্যকা অতিক্রম করিবার সময়ে প্রবল বারিপাতের মধ্যে এই বনানী মধ্যে মানুষগুলা আশ্রয় লইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, বৃষ্টি থামিলে আবার যাত্রা সুরু করিবে। বৃষ্টি থামিল না, যাত্রা স্থগিত রহিল। এদিকে রাত্রির অন্ধকার আর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অন্ধকার বনানীর অন্ধকারকে এমন ঘনীভূত করিয়া ফেলিল যে, মানুষ নিজেকেও আর দেখিতে পায় না। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকিয়া উঠে।

দেখিতে যে পায় না সে ভাল। কেন না সেই সময়ে অকস্মাৎ আলোক প্রকাশ পাইলে মানুষ দেখিয়া স্তম্ভিত হইত যে মানুষের সঙ্গে বনের হিংস্র পশু—কেহ কাহাকেও চিনে না, কাহারও সহিত কাহারও পরিচয় নাই—কেমন মিতালী পাতাইয়া, পাশাপাশি বসিয়া, পাশাপাশি শুইয়া আছে। একটা লোক গাছের ডালে কোমর বাঁধিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইতে মনে হইল, কে যেন দুই হাতে খুব কঠিন করিয়া তাহার গলাটা চাপিয়া ধরিতেছে, কণ্ঠ রোধ হইবার উপক্রম। চীৎকার করিতে গেল, কণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না; অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, হাত বাড়াইয়া, কাহার হাত অনুভবে বুঝিতে গিয়া বুঝিল, সেটা হাত বটে, তবে মানুষের নহে, কালের হস্ত তাহার গলবেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। শমনের এই অহিংস্র বাহনটির কাজই এই; হিংসার পথ দিয়া সে হাঁটে না। মানুষ বা গরু বাছুর ছাগল ভেড়া যাহা পায় তাহাকেই প্রেমভরে আলিঙ্গন

করে। প্রেমালিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া একটু চাপ দিতেই জীবাত্মার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। প্রেমিক তাহা বুঝিতে পারে। আলিঙ্গনে আবদ্ধ দেহের উত্তাপরহিত হইবামাত্র আলিঙ্গন শিথিল হইয়া পড়ে, আলিঙ্গন পরিত্যক্ত হয়।

লোকটা কৌশল জানিত কিম্বা জানিত না ঠিক বলা যায় না—বোধ হয় জানিত। অতি সন্তর্পণে শাণিত ছুরিকা দ্বারা প্রেম-পাশ ছিন্ন করিতেই কণ্ঠ চাপ-বিমুক্ত হইল, হাঁকিল, জয় হিন্দ !

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সাড়া দিল, জয় হিন্দ।

পর পর দুইটি জয় হিন্দ ধ্বনির পরে, অনেকগুলি কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, জয় হিন্দ।

মানুষগুলা ভরসা পাইল; বুঝিল, বৈকালে যাহারা ছিল, তাহারা এখনও আছে। ভরসার সঙ্গে সাহস, সৈনিকের সাহস, অন্ধকারের বক্ষোভেদ করিয়া, বৃষ্টির শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া, গর্জ্জন করিল, দিল্লী চলো।

সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে গর্জ্জন উঠিল, দিল্লী চলো।

ইহারা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী। দূরযাত্রা করিয়াছিল, পথে দৈবদুর্ব্বিপাক, পর্ব্বত-অধিত্যকায়, অরণ্যানী মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। তারপর এই আকাশ প্লাবন।

আর একবার আকাশ-ভুবন কাঁপিয়া ধ্বনি উঠিল—জয় হিন্দ !

আর একবার অন্ধকার খণ্ডে খণ্ডে বিখণ্ডিত হইয়া শব্দ উঠিল—দিল্লী চলো।

যে যেখানে ছিল, যেমন অবস্থায় ছিল, গর্জ্জিয়া উঠিল, দিল্লী চলো! জয় হিন্দ!

অন্ধকার যেন ভয় পাইয়া ফিকে মারিয়া গেল—আকাশখানাকে অনেকক্ষণ পরে একটু যেন দেখা গেল। দেখা গেল যে অনেকগুলা মেঘ—মেঘের গায়ে মেঘ, মেঘের উপরে মেঘ, তাহার উপরে

মেঘ যাওয়া আসা, আসা যাওয়া করিতেছে। কখনও বা একটু ঠোকাঠুকি হইয়া গেল, একটুখানি বিজলী ঝলক দেখা গেল।

বিজুরী আলোকে বনভূমি দেখা গেল। মনে হইল লুপ্ত জগৎ পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গেল! উল্লাস-আনন্দ ভরে আবার গাহিল, জয় হিন্দ!

আবার বিজলিবালিকা হাসিয়া উঠিল। আবার, আবার, আবার। অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা গেল। উল্লাসে উন্মত্ত অধীর হইয়া লোকগুলা গাহিল, দিল্লী চলো।

দিল্লী চলো।

বৃষ্টি কমিয়া আসিল! মানুষ হারানো প্রাণ ফিরিয়া পাইল। ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দে গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। কোথায় আলো, কোথায় মশাল, রসদ কোথায়, খানা কই—কয় দণ্ড মধ্যে নির্জীব বনভূমি সমারোহে ভরিয়া উঠিল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। মেঘও নিঃশেষে শেষ হইয়া গিয়াছিল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। একটি দুইটি তিনটি করিয়া আকাশ নক্ষত্রের উপবন হইয়া গেল।

জয় হিন্দ! সুসময় বুঝিয়া একটুকরা নির্লজ্জ চাঁদও কালামুখে হাসি টানিয়া স্বপ্রকাশ হইলেন। দূরের পাহাড় ধূম গিরির মত দেখা যাইতে লাগিল। অধিত্যকাপ্রান্তবাহিনী নদীবুকে বুকভরা জল খণ্ড চন্দ্রটিকে লইয়া লুকোলুকি করিতে লাগিল। বনভূমি হইতে বৃষ্টির জল নানা পথে, নানা ভাবে নানা রব তুলিয়া অববাহিকার রূপ ধরিয়া সমতলভূমির উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল।

আজাদীরা উনান ধরাইতে বসিয়া গেল; ভাঁড়ারী রেশন মাপিতে গেল; তরকারী কুটিবার বঁটী আসিল; মশলা পিষিবার শিলনোড়া আসিল; ভাতের হাঁড়ী, রুটীর চাটু বাহির হইল। এমন সময়ে ভাঁড়ারী খবর দিল, সামান্য আটা যাহা ছিল, তাহা

বৃষ্টিতে ধুইয়া গিয়াছে; থলিয়ায় চানা আছে, আর কিছু নাই!

নাই? কুছ পরোয়া নেহি!—জয় হিন্দ!

জয় হিন্দ! বনে কি ঘাস নাই?

ঘাসের রুচী ত মন্দ নহে। ঘাস অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ পেট ভরিয়া খাইতে দিত কিন্তু যেদিন ইংরাজ শার্দ্দুলভয়ে ভীত রাখাল বালকের মত গো মেষ মহিষপাল ফেলিয়া অদৃশ্য হইল, সেদিন জাপানী—

কড়ি দিয়ে কিনলাম
দড়ী দিয়ে বাঁধলাম
ভ্যা কর তো বাপু

করাইয়া, দাসত্বে আবদ্ধ করিল, সেদিন হইতে ঘাস ও জাপান-সমুদ্রের শঙ্কর মাছের চাবুক অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। জাপানীর কৃপাদত্ত ঘাস যদি অভ্যাস হইয়া থাকে, দিল্লীর পথের ঘাস দিল্লী-অভিযাত্রী সানন্দে না খাইবে কেন?

মশাল জ্বলিয়াছে, গাছের ডালে ডালে মশাল ঝুলিতেছে, বাটুনী ঘাস বাটিতেছে; কেহ গামলায় ফেলিয়া ছোলা ধুইতেছে; কেহ ভাঙ্গা জাপানী মান্দোলিনটির তারে বিস্মৃত রাগিনীর ঝঙ্কার তুলিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে; কেহ বা অদেখা কোন্ আননের না-ফোটা হাসির নেশার গানে বনভূমি সচকিত করিয়া তুলিতেছে; কেহ শুধু হাসিতেছে; কেহ বা শুধুই 'গপ' করিতেছে, অকস্মাৎ শিবির সীমানা-রক্ষী হাঁকিল—হুঁসিয়ার!

আজাদী সাড়া দিল, হুঁসিয়ার! দিল্লী চলো।

দিল্লী চলো, অর্থাৎ তল্পী তোলো। শত্রুর চর সন্ধান পাইয়াছে; এখানে আর নয়।

এমন নিত্যই হয়। মুখের রুটী পড়িয়া থাকে, বনে জঙ্গলে

আত্মগোপন করিতে হয়। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, লুকাইয়া থাকিতে হয়; আহার নিদ্রার অবসর হয় না। তল্পী তুলিতে হয়। দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, শত্রুর চর, কখনও বেশে, কখনও ছদ্মবেশে, 'খুঁজি খুঁজি নারী' করিয়া সন্ধান না পাইয়া চলিয়া গিয়াছে জানিতে পারিলে, আবার জয় হিন্দ, আবার দিল্লী চলো ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। আবার বাহির হইতে হয়।

আজাদী গল্প বলে, আজাদী গল্প শুনে। একজন রাজার রাণী পর্ব্বতের গুহায় রুটী বানাইতেছিল, শত্রুর খবর আসিল; সব ফেলিয়া পালাইতে হইল। একদিন রাণী কচি ছেলেদের রুটী খাইতে দিতেছিল, একটা বন্য শূকর আসিয়া সব কয়খানি রুটী খাইয়া গেল। ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় চীৎকার করিতে লাগিল। রাণীর চোখ দিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িল।

তল্পী তল্পা—সে আর এমনই বা কি ভারী! একটি করিয়া ছিন্ন কন্থা, অনেকের আবার তাহাও নাই—গুছাইয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশের উদ্যোগ হইতেছে, সীমান্ত-রক্ষী হাঁকিল, জয় হিন্দ!

জয় হিন্দ! তবে ত শত্রু বা শত্রুর চর নহে। এই রক্ষীই হুঁসিয়ারী হাঁক ছাড়িয়াছিল, সেই জয় হিন্দ হাঁকিল। আজাদী পুঁটলী পাঁটলা নামাইয়া বসিল। আবার উনানে কাঠ ঠেলিতে উদ্যত হইল।

জয় হিন্দ!—সীমান্ত রক্ষীর কণ্ঠস্বর শূন্যে লীন না হইতেই পর্ব্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা বিকম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল, নেতাজী জিন্দাবাদ!

নেতাজী জিন্দাবাদ!

মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে না। বিশ্বাস করিবেই বা কিরূপে? সাত দিন আগে, তাহারা নেতাজীর আশীর্ব্বাদ শিরে বহন করিয়া

দূর যাত্রা করিয়াছে, সাতদিনে সাতটা জেলা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, এখানে, নেতাজী জিন্দাবাদ ?

কিন্তু অবিশ্বাসেরও আর অবকাশ ছিল না। স্বপ্ন নহে—শত্রুর চাতুরীও নহে, নেতাজী, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস্ সশরীরে তাহাদের সম্মুখে !

নেতাজী জিন্দাবাদ।

আকাশ প্রান্তর পর্ব্বত অরণ্য এক সঙ্গে এক দিল্, এক মন-প্রাণ হইয়া ধরিত্রী কাঁপাইয়া তুলিল।

জুতা দেখা যায় না, এক হাঁটু কাদা, সর্ব্বাঙ্গে কাদার ছিটা, কাঁটা গাছে লাগিয়া পোষাক শত ছিন্ন। এই দীর্ঘ পথ তিনিও পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছেন। দরিদ্র ভারতের দীন আজাদীর নায়কও দীন দরিদ্র। পথে, আজাদী সমস্ত শিবিরই পরিদর্শন করিয়াছেন। পরিদর্শন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, আজাদীর ব্রত পূর্ণ হইতে বিলম্ব নাই।

নেতাজী এক্ষণে সর্ব্বাগ্রগামী আজাদী ফৌজদের দেখিতে আসিয়াছেন। ইহাদিগকে বহু দূর দিল্লী যাত্রায় পাঠাইয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই, দুর্গম, বিপদসঙ্কুল দূর পথ, নেতাজী কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ?

সেই সময়ে আকাশের একটি কোণে কি উষার রক্তিমচ্ছটা উঁকি দিয়াছিল ? তাহারই অতি সূক্ষ্ম রশ্মি একটি কি সকলের অগোচরে নেতাজীর আননোপরি বিচ্ছুরিত হইয়াছিল ? কে জানে! আজাদী হয়ত উষার প্রথম প্রকাশ, তরুণ অরুণালোকের অগ্রদূতটির বিকাশ দেখিয়াছিল, আজাদী এমনটি আর দেখে নাই, এমনটি কভু শুনেও নাই! বিমুগ্ধ বিমোহিত আজাদী সেদিনের সেই প্রভাতে অপ্রকাশ্য অদৃশ্য প্রভাত দেবতার জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টির তলে যে দৃশ্য দেখিল, অনন্ত-কাল পর্য্যন্ত তাহার সুখস্মৃতি বহন করিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে।

নেতাজীকে সেইস্থান হইতে ফিরিতে বলিয়াছিল। তিনি তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

"তোমরা সকলের পুরোভাগে বাহির হইয়াছ; তোমাদের না দেখিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি?"

আজাদী বলিতে গেল, নেতাজী জিন্দাবাদ—

নেতাজী বলিলেন, না ভাই না—ইনকুইলাব জিন্দাবাদ!

ইনকুইলাব জিন্দাবাদ।

ঘাসের রুটি, আর ভিজা ছোলার রাজভোগ রচিত হইয়াছিল। সর্ব্বাধিনায়ক সকলের সঙ্গে, সকলের পার্শ্বে বসিয়া সেই যে রাজভোগ সম্ভোগ করিলেন, ক্ষুদ্র আজাদী তাহার জীবনের অনেক সুখ, অনেক আনন্দ, অনেক ঐশ্বর্য্য ভুলিবে, সেইদিনের সেই কথাটি কিন্তু ভুলিবে না।

একদিন সংবাদ আসিল, শত্রুর চর আজাদীর অবস্থিতি জানিতে পারিয়াছে। শিবির ভঙ্গের আদেশ প্রচারিত হইল। শিবির ত কত? কতগুলা ছেঁড়া চ্যাটাই আর নিজ নিজ পোঁটলা পুঁটলী। সেইগুলা বগলদাবায় পুরিয়া ছুটিতে হইবে।

সংবাদ আসিল, আজাদী বিভীষণই ঘর ভাঙ্গিয়াছে।

বিভীষণ সব দেশে, সব সময়ে, সব জাতির মধ্যেই জন্মিয়াছে, সর্ব্বত্রই আছে। আজাদী ফৌজে বিভীষণ না থাকিবার কথা। কারণ আজাদী কাহারও রাজ্য আক্রমণ করিতে যায় নাই; আজাদী অপরের দেশ লুণ্ঠনে যায় নাই; আজাদী চলিয়াছে, নিজের দেশে, নিজের জন্মভূমিতে। অরক্ষিত, অতর্কিত স্বদেশ রক্ষা করিতে চলিয়াছে; কাজেই আজাদী ফৌজে বিভীষণ থাকিবার কথা নহে। কথা যাহাই হৌক, দেখা গেল, বিভীষণ ছিল। কুসুমে কীট না

থাকিলেই শোভন হয়; কিন্তু কুসুমে কীট অনিবার্য্য। গঙ্গার পবিত্র বক্ষে অশুচির স্থান নাই; কিন্তু গঙ্গাগর্ভেও হাঙ্গর কুম্ভীরের বাস।

একটা গভীর জঙ্গলের খবর পাওয়া গিয়াছে। আত্মগোপনের এমন যোগ্য স্থান আর নাকি নাই। সেইদিকে, ওরে সেইদিকে— দিল্লী চলো।

সন্ধ্যা সমাসন্ন; অন্ধকার গাঢ় না হইতে অরণ্য-প্রবেশ করিতে হইবে। বনপথ, হিংস্র জন্তুর ভয় আছে, 'অন্য' ভয়ও যে নাই এমন নহে। সেনাবাহিনীকে সতর্কতার সহিত পথ চলিতে হয়। শব্দ করাও বারণ?

পথিপার্শ্বস্থ ঝোপের অন্তরাল হইতে মনুষ্য কণ্ঠের ক্ষীণ স্বর উত্থিত হইল। কে যেন অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ, অতীব করুণ কণ্ঠে কহিল, জয় হিন্দ।

সেনানী স্তব্ধ হইল। আর তাহার পা উঠিল না। সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝোপের আড়ালে যে ছিল সে করুণকণ্ঠে আবার কহিল, জয় হিন্দ।

শত্রুর চর হইতে পারে, প্রতারক হইতেও পারে। তথাপি "জয় হিন্দ"—বার বার "জয় হিন্দ" শুনিয়া আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। বলিল, জয় হিন্দ।

উত্তর আসিতে বিলম্ব হইল না।

আমি মরিতেছি। কিন্তু কে তুমি? তুমি কি?—

সেনানী কহিল, আমি—জয় হিন্দ! বলিয়া সে সেই ঝোপ মধ্যে প্রবেশ করিল। অজ্ঞাত—অপরিচিত, কিন্তু স্বগোত্র, তাহাদেরই স্বগোষ্ঠি বটে। দেখিয়াই বুঝিল, অন্তিম সন্নিকট, বিলম্ব নাই। তাহার পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কোন উপকার করিতে পারি কি?

মৃত্যুযাত্রীর মলিন মুখে দীপ্তি ফিরিয়া আসিল; ক্ষীণ কণ্ঠে বল সঞ্চার করিয়া কহিল, পারো! করিবে?

নিশ্চয়ই করিব।

জয় হিন্দ! আর আমার দুঃখ নাই। বলিয়া আসন্নমৃত্যু সেনানী একবার—বুঝি বা শেষবার পৃথিবীকে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল। পৃথিবীর উপরে সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া নামিয়া আসিয়াছে অথবা তাহার দৃষ্টি উদাস হইয়া গিয়াছে; দেখিতে পাইল না; হতাশায় মলিন হইয়া গেল, দুটি চক্ষু। অশ্রুর উৎস উঠিয়া কণ্ঠরোধের উপক্রম করিল; অতি কষ্টে বলিল, ভাই, নেতাজীকে ব'লো—হয় দিল্লী চলো, না হয় দিল্লীর পথে মরণ আমার ব্রত ছিল। দিল্লী পৌঁছতে পারিনি, দিল্লীর পথের শয্যা পেয়েছি। নেতাজীকে ব'লো ভাই, আজাদী ব্রত রক্ষা করেছে। জয় হিন্দ!

জয় হিন্দ জিহ্বায় রহিয়া গেল, আজাদীর দেহমুক্ত আত্মা মুক্তবায়ুপথে কোন্ শূন্যে মিলাইয়া গেল। আর একজন আজাদী মৃতদেহের পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে পথ নির্দেশ করিতে গদগদ কণ্ঠে গাহিল, জয় হিন্দ।

জয় হিন্দ!

বন্দে মাতরম্!